বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ • কাজী সাইফুল ইসলাম • JP

Pathak Shamabesh
Since 1987
Bangabandhu Sheikh M
4385902
Tk. 135.00

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্র অবলম্বনে

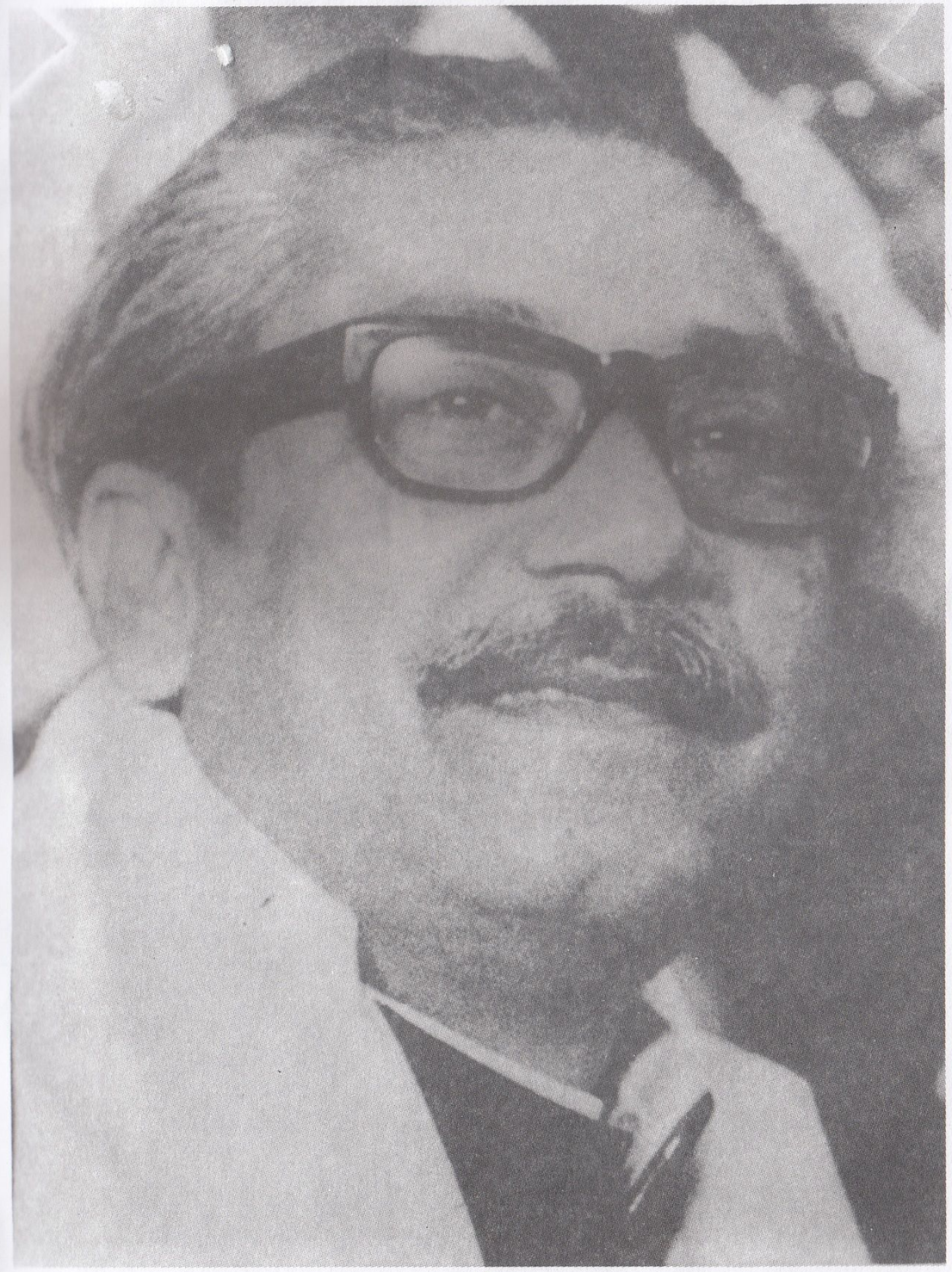
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ

কাজী সাইফুল ইসলাম



Northern University * Bangladesh *
NUB Library

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম : ১৭ মার্চ ১৯২০ / মৃত্যু : ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
ও
বাংলাদেশ

কাজী সাইফুল ইসলাম



JP

জয় প্রকাশন ॥ ঢাকা

88-02-9669555
এক মনের জন্য দু
পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র
Dhaka Bangladesh
Established 2014
jpthak@bol-online.com

NUB LIBRARY
ACCESSION 98775
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

JP

পুনঃমুদ্রণ
মার্চ ২০১৪

প্রকাশক
জয় প্রকাশন
৩৮/২-খ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

অক্ষরবিন্যাস
কমপিউটার ল্যান্ড
৪৭/১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

মূল্য
১৩৫.০০ টাকা

ISBN 984-70154-0085-5

উৎসর্গ
সজীব ওয়াজেদ জয়-কে



সূচিপত্র

অন্তিম প্রশ্ন	৯
সূর্যের আলো হাতে আবির্ভাব	১৫
আত্ম স্ফুরণ	১৯
প্রাণের ভাষা	২৪
পুঞ্জিভূত মেঘে তাড়িত বায়ুর মতো সম্মুখে এগিয়ে চলা	৩৬
ছয় দফা	৪৩
'৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান	৪৭
ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী	৪৯
'৭০-এ সাজানো নির্বাচন	৫২
স্বাধীনতার ডাক	৫৬
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ	৫৭
বিভৎস সেই কালরাত্রী	৬২
যুদ্ধ	৬৫
দেশে ফেরা	৭৪
পারিবারিক জীবন	৭৫
দেশ পরিচালনা	৭৬
বঙ্গবন্ধু ও নজরুল	৭৯
মহাপ্রয়াণের সেই দিন	৮০
শ্রেষ্ঠ বাঙালী	৮৫

১. হলো না ফেরা (উপন্যাস) প্রকাশিত
২. কুড়িয়ে তুমি নিও (উপন্যাস) প্রকাশিত
৩. রক্তস্রোত (মু. যু. উপন্যাস) প্রকাশিত
৪. পোড়া মাটির মেয়ে (উপন্যাস) প্রকাশিত
৫. মেঘবালিকা (উপন্যাস) প্রকাশিত
৬. নীলা এবং নয়টি নীলপদ্ম (উপন্যাস) প্রকাশিত
৭. পথে যেতে যেতে (উপন্যাস) প্রকাশিত
৮. তিথি আজ চলে গেছে (উপন্যাস) প্রকাশিত
৯. একুশ আমার মায়ের হতে একটি পলাশ ফুল
(ভাষা আন্দোলনের লেখা উপন্যাস) প্রকাশিত



অন্তিম প্রশ্ন

আজ জীবনের এইক্ষণে, যখন যৌবনের উচ্ছসিত স্ফূত শিখা আমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে জড়ানো। হৃদয়ের মাঝে রৌদ্র-রুদ্র রূপ প্রতিক্ষিত প্রতিক্ষণে। রক্তের প্রতিটি ধমনি আর দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে জমে থাকা বিশুদ্ধ কোষগুলো কেবলই ভালবাসতে চায় আমার বাঙলাদেশকে ভাষা ও শ্রেষ্ঠ সন্তানদের।

যখন ভাবলাম তাকে নিয়ে লিখবো। সে আর কেউ নয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী। যার হৃদয়ের প্রতিটি রক্তকণা আর নিঃশ্বাসে জড়িয়ে আছে বাঙলা শব্দটি। কি এক নিবিড় ভালবাসায় তাঁর আষ্টেপৃষ্ঠে, আর গভীর যতনে তার হৃদয়ে মন্দিরে বাঙলাকে তিনি ধারণ করে আছেন।

বাঙলার মানুষের কথা ভেবে যিনি কাঁদতেন সরল আঁখি জলে। যিনি হাসতেন হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে। বাঙলার দুর্দশা দেখে আবার দু'চোখে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে নিতেন অকুণ্ঠিত।

আমি আমার ক্ষুদ্র লিখনিতে আর অপক্ক অক্ষরে কি লিখবো হিমালয়ের মতো এই মানুষটির সম্বন্ধে, তাই ভেবে সংঙ্কুচিত হতে লাগলাম বার-বার। কেন যেন সাহস হচ্ছিল না। হৃদয়ের উর্ধ্বশ্বাস আর সঞ্চলিত রক্তের উদ্দামতায় বার-বার যখন কুণ্ঠিত আমি। ঠিক তখন মনে হলো, যে মানুষটি আপনার চেয়েও আপন হয়ে রয়েছে আমাদের হৃদয়ের মাঝে, তাকে নিয়ে কিছু না লিখলেই যেন নয়। যদি ভুল হয়, যদি তাঁর সঠিক মূল্য, ভাব ফুটিয়ে তুলতে না পারি তাহলে ক্ষমা পাবো নিশ্চয়ই। কারণ ঈশ্বর জানেন আমার অন্তরের অন্তিমটুকুও।

সেই বিশ্বাসেই লিখতে বসলাম। জানিনা কতটুকু পারবো। যদি বিধাতা বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে সারা জীবনই হয়তো লিখে যাবো কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গান। কিন্তু তাকে নিয়ে কিছু না লিখলে যেন বৃথাই যাবে এ জীবন।

যে মানুষটিকে স্বচক্ষে দেখিনি কখনো। আমার জন্মের আগেই তাঁর আত্মার সমাপ্তি। কিন্তু তাঁর কর্ম বিশাল। সে যে অবিনশ্বর। আত্মা মানুষকে অমর করে না কখনোই। অমর করে রাখে তার কর্ম।

যেমন আমাদের সকলের হৃদয়ে আছেন তিনি,
বাঙলার ধুলোমাখা পথে-প্রান্তরে,
ফুলের গন্ধে,
নদীর তীরে-তীরে,
সমুদ্রের খোলা হাওয়া,
উদাসী বাঁশির সুরে,
বাউলের গানে,
কবির কবিতায়,
হৈমন্তের শিশির ভেজা ঘাসে,
সবুজের বুকে,
বাঙলার অন্তরে,
ভাষার গভীরে,
পাখির ডাকে,

প্রভাতি সূর্যোদেবের নরম রোদে,
নিদাঘের রোদ্র তাপে,
শ্লোগানে-শ্লোগানে,
মিছিলের তালে,
অগম্য-অনিরুদ্ধ পথ চলিতে।

বাঙলার প্রতিটি পথে প্রান্তরে চির অমর হয়ে আছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তার শেষ নেই। বাঙলার প্রতিটি নতুন জন্মের সাথে তার গভীর সম্বন্ধ আঁকা। যেমন বকুল বিজ থেকে উৎগত নব বকুলের প্রাণ।

যে বাঙলায় জড়িয়ে আছে মোর প্রাণ। যে বাঙলার মর্মে-মর্মে শত-সহস্র বার উচ্চারিত নজরুলের 'চির উন্নত শির'। যে বাঙলার প্রাণের প্রাণে শত-সহস্র-লক্ষ-কোটি বছর, আদি-অন্তিমে বার-বার ধ্বনিত, শেখ মুজিব শেখ মুজিব–

যেন বৃক্ষ তিনি ।
ছড়ায়ে দিয়েছে শাখায়-শাখায়
ভরে দেন ফুলে-ফলে,
তা থেকে সংগ্রহ বীজ।
বাঙলার উর্বর মৃত্রিকায়, তা
বপনেই
উৎগত শত সহস্র বাঙলা প্রাণ।
আর প্রতি ক্ষণে-ক্ষণে
বাঙলার প্রতিটি প্রাণ
এক সাথে বলে উঠে
আমি বাঙালী।
আমি স্বাধীন।
আমার দেশ আছে,
ভাষা আছে,
আছে অক্ষর।
আছে পিতা,
আছে আদর্শ,
বাঙলা মাতার অবগুন্ঠিত
সুরক্ষিত গহ্বরে
আমার জন্ম।
আমি প্রতিবাদি।
আমাকে শিখিয়েছেন মোর পিতা।
তাই আমি অকুন্ঠিত।
আমি বিলাসি জীবন পিপাসু নই।
অন্ধ স্তবির যৌবন লোভি নই।
আমি অত্যাচার, নির্যাতন
প্রতিবাদে তরুণ প্রাণ।
আমি মৃত্যুঞ্জয়।

আমি আমার।
আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আজ যে শিশুটির আগমন এই ধরণীতে। পৃথিবী থেকে কোন একদিন তার প্রস্থান চির সত্য। সময়ের হাত ধরে বেড়ে উঠা শিশুটির পরিবর্তন নিত্যকার। কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়, বৃদ্ধ। তার পর দেহত্যাগ।

কিন্তু একটি শিশুর চোখে স্বপ্ন এঁকে দিয়ে তাকে বহু দূরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একটি পথ দেখানো। একটি দেশের কথা শোনানো। একটি ভাষার প্রতি গভীর সম্মোহনীয়তায় তাকে উন্নত করা। এ যেন শ্রেষ্ঠ কর্ম।

সারা জীবন ধরে তাই করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। একাত্তরের কিছুকাল আগেও নির্যাতন আর বৈষম্যতার শিকার হয়ে শুধু বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাঙলার মানুষ। অকাতরে জীবন দিতে হয়েছে তাদের। প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়েছে স্তব্ধ।

এই মানুষগুলোর সাথে এক হয়ে পথ দেখিয়েছেন একটি স্বাধীন দেশের। যেখানে কথা বলা যাবে স্বাধীন ভাবে। যত্র-তত্র মরতে হবে না বিনা বিচারে। রক্তচক্ষু সহ্য করে কাঁদতে হবে না নিভৃতে। বুভুক্ষ থেকে মরবে না কেউ। বস্ত্রহীন হয়ে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকবে না কোন কুমারী যুবতী।

সেই সুন্দর স্বাধীন তার পথ দেখিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি বিশ্বাস করতেন বাঙলাকে। ভালবাসতেন মানুষকে। যদি বলি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন বাঙলার মানুষকে। তবে কি ভুল বলা হবে?

আমার মনে হয় মোটেই নয়। সে তার কথা ও কাজে জেনেছি বহু বার। বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে দেয়া সাক্ষাতকারে তিনি বহু বার বলেছেন, বাঙলাকে ভালবাসার কথা।

আজও যেন বিমূর্ত-অমূর্ত ভেসে আছে সেই কণ্ঠ, সেই কান্না, সেই ভালবাসার ডাক, দেশ গড়ার স্বপ্ন, সংগ্রামের কথা। কি কষ্ট! বিষাদে ভরে উঠে মন। কেন চলে যায়? কেন আমরা ঋণী হই বার-বার?

তাঁর রক্তের ঋণ কেন যেন বার বার প্রশ্ন হয়ে চেপে ধরে নিঃশ্বাসের অন্তিমে। কেবলই ক্ষীপ্ত হয়ে বলে উঠে, অপরাধ!!!

তার ডাকে বাঙালী জাতি পেয়েছে এক স্বাধীন দেশ, সেটাই কি অপরাধ ছিল তাঁর?

না কি তাকে হত্যা না করতে পারলে লুটেপুটে চেটেপুটে খাওয়া যাবে না দেশটাকে ?

না কি বাঙলার প্রতি বিদ্বেষ ?

না কি জাতির জনকের উদার ক্ষমা ?

কেন যেন বার-বার মনে হয় জাতি হিসেবে আমরা কতটা সুখি? কতটা সভ্য, কতটা বর্বর ? কতটা নৃশংস ? কতটা পাষন্ড ? কতটা ঋণী ?

যাত্রা পথে যাত্রী থাকেন লক্ষ-কোটি। কিন্তু পথ দেখান একজনই। তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনিই মহান।

যার ডাকে সারা দিয়ে সংগ্রামে প্রস্তুত কোটি-কোটি মানুষ। দেশের জন্য তার কথায় হাসি মুখে শহীদ হয়েছে লক্ষ-লক্ষ তাজা প্রাণ। তাঁর আহ্বানে এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দিন মজুর হতে শুরু করে বুদ্ধিজীবি শ্রেণী। তা থেকে বাদ পরেনি জননী হতে শুরু করে পতিতা পর্যন্ত।

রুশ অক্টোবর বিপ্লবের পর সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে কমিউনিষ্ট প্রতিষ্ঠিত হলো চীনে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে এক করে তুললেন মাও সে তুং। তাঁর নেতৃত্বে মাত্র ছ'হাজার সমর্থক নিয়ে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বারো হাজার বর্গমাইল হেঁটে দক্ষিণ হুনান, কুকেন, ইংয়াংমি দীর্ঘ পথ লং-মার্চ করে এগিয়ে যান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন, কার্ল মার্কস সামন্ততান্ত্রিকতার সম্রাটের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে কমিউনিস্ট নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সামর্থ বা বিপ্লবীর কত ভাগ ছিল। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে। সে দেশের অর্ধেকেরও অনেক কম।

কিন্তু শেখ মুজিবই একমাত্র স্বার্থক নেতা। একটি পুরো জাতির প্রায় শত ভাগ এক করতে পেরেছিলেন তিনি, স্বাধীনতার ডাকে। দু-দশ জন দেশের বিরোধিতা করে হয়তো কিছু ক্ষতি করেছে। কিন্তু তাদের কাজের কোন রকম তোয়াক্কা করেন নি আমাদের মুক্তি সেনারা।

যার অন্তরে মুক্তির বীজ উৎগত। কোন কঠিন পাথর চাপেও তাকে রুখতে পারে না। সে যে অনন্তের পথের পথচারি। চলার পথের অন্তরায় যে কোন কঠিন শিলা ভেঙ্গে যাবেই। সে প্রমাণ আমাদের দেশের মুক্তি সেনাদের কাছেই। না হলে একটি সুসজ্জিত, দক্ষ, সেনা দলের ট্যাংক, কামান আর আধুনিক সব অস্ত্রের সম্মুখে এক প্রকার খালি হাতেই দেশটাকে স্বাধীন করা যেতো না মাত্র ন'মাসেই।

শেখ মুজিব তার অসীম দৃঢ়তা তার দেশ ও মানুষকে ভালবেসে যে নতার শপথ নিয়েছিলেন। সেই শপথই যেন সত্যের ফুল হয়ে ফুটেছিল কটি মুক্তিকামী মানুষের অন্তরে।

দেশকে ভালবেসে হাসি মুখে জীবন দিতে শুধু বীরেরাই পারে। ভীরু যারা তারাই ভালবাসে সুবিধা পেতে। চোখ বন্ধ করে ক্ষমতার সাথে জড়িয়ে থাকতে চায়। হোক সে অন্যায়। হোক সে হীনতা।

পৃথিবীর বহু স্বাধীনতাকামী মানুষের মধ্যে বঙ্গবন্ধু অন্যতম। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশে রয়েছে এমন বহু নেতা যারা আমরণ যুদ্ধ করে যাচ্ছেন স্বাধীনতার জন্য।

কেউ পেয়েছেন, আবার কারো-কারো মরতে হয়েছে পরাধীন থেকেই। সে দিক দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান একশ' ভাগ পরিপূর্ণ। তার এক কথায় বাঙলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীন দেশের আশায়। একটি বারও কেউ ভাবেন নি, আমরা কি পারবো ?

আসলে অন্তর যার বিদ্রোহের আগুনে পরিপূর্ণ। যিনি অন্যায় মানতে পারেন না। তাই তার আর কিছুরই দরকার হয় না যুদ্ধের জন্য।

আমরা কি পারবো ? এই প্রশ্ন দ্বার বন্ধ ছিল সবার অন্তরে। মুজিব তার আকাশের মতো হৃদয় আর ভালবাসা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন মানুষকে। তার ভালবাসাতেই তার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়েছিল বাঙলার মানুষ।

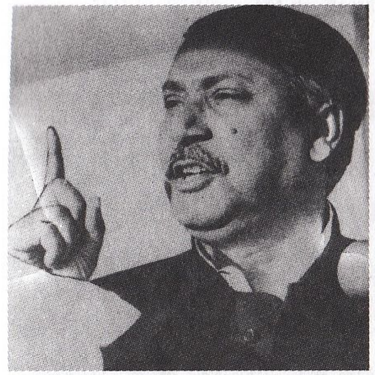
তিনি সবাইকে বুঝাতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা ছাড়া কোন মানুষ তার পূর্ণতা পায় না। অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিনিয়ত। দাস হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

তাইতো সেদিন তিনি বুকের সবটুকু বিদ্রোহ কণ্ঠে ঢেলে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।'

সেই অটল-অনঢ় হিমালয়ের মতো বিশাল মানুষটি কোন কাজে কখনোই ভয় পান নি। পাক বাহিনীকেও নয়। বার-বার তাকে মেরে ফেলতে গিয়েও থমকে গেছে বর্বর পাক বাহিনীর অস্ত্র। কিন্তু আমাদের কি দুর্ভাগ্য! তাকে মরতে হলো বাঙালীর হাতেই। স্বাধীন বাঙলাদেশে।

এত সবের পর সব বাধা ভেঙ্গে যখন দেশ স্বাধীন হলো। তখন সেই স্বাধীন দেশেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো তাকে। কি আশ্চর্য! তাও প্রতিবাদহীন।

যেন অদৃশ্য অপদেবতার নগ্ন সুগঠিত কারসাজি। সবই যেন সু-পরিকল্পিত। আর পুরো দেশটা যেন নিরব দর্শক। আবার সহজভাবে তা মেনেও নিল অনেকেই।



সূর্যের আলো হাতে আবির্ভাব

শব্দটির সাথে কি এক বিশালতা জড়ানো। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯-র যদি সক্রেটিসের জন্ম সেই প্রাচীন গ্রীসে না হতো, তাহলে হয়তো পৃথিবী আঁধারেই ঢাকা থাকতো আরো বহু কাল। সভ্যতা এসে দাঁড়াতো না এথেন্সে। আলো হাতে অন্ধকার দূর করতে অকুণ্ঠিত নিজের জীবন দিয়েছেন সক্রেটিস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে পৃথিবীকে সভ্য করতে তার এই আত্মত্যাগ।

সূর্যের দীপ্ত শিখা হাতে এই বাঙলার বুকে যদি না আসতেন শেখ মুজিবুর রহমান। তবে হয়তো বাঙালী জাতি পরাধীনতার শিকলে অবরুদ্ধ থেকে যেতো আরো বহুকাল, বহু বছর, বহু ক্ষণ, দীর্ঘ সময়।

যদি বহুকাল আঁধারে ঢেকে থাকতো পৃথিবী, যদি দগদগে সূর্যটা তার কখনো প্রভাতি আলো আবার কখনো বিকেলের নরম রোদের আলিঙ্গনে উষ্ণ না করতো পৃথিবীকে। তাহলে প্রকৃতি হারাতো তার জীবনে সাধ।

সূর্যের আলো যেমন ঘন ঘোর আঁধার দূর করে, মলিন বৃক্ষপত্র সবুজের বুকে যেমনি করে হাসি ফুটিয়ে তোলে। ঠিক তেমনি বাঙালীর এক দারুন ক্লান্তি লগ্নে তাঁর জন্ম।

বাঙলা নামক এই প্রাচীন জনপথটি যখন সিমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন আর বঞ্চিত হতে-হতে নিরব আঁধারের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছিল। তখন সমস্ত আধারের বুকে এক টুকরো প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখা হয়ে এলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

আলো দূর করে আঁধার। আর প্রাণের আঁধার দূর করতে চাই জ্ঞান, ভালবাসা ও পবিত্রতা। এসব মিলিয়ে যেন এক অসামান্য জ্যোতি ছিল তাঁর অন্তরে।

সেই জ্যোতি নিয়েই তাঁর পথ চলা। আর মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা অদম্য এক বাসনা। দেশের জন্য মানুষের জন্য কাজ করা।

বাঙলার নিরিড় সুন্দর গাঢ় সবুজ আর প্রকৃতির উদারতায় ঘেরা শান্ত ছোট্ট একটি গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। গ্রামের কোল ঘেষে মায়াবী বহমান নদী। নদী আর গ্রাম্য সেই জনপথটির যেন চির দিনে মিতালী। একই সুতোয় গাঁথা।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চের কোন এক শুভক্ষণে জন্ম হয় শেখ মুজিবুর রহমানের। পিতা শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের সাথেই টুঙ্গিপাড়ায় বাল্যকাল কাটে শেখ মুজিবুর রহমানের। তখন প্রকৃতির সাথে গভীর ভাব তার। প্রকৃতির সাথে মিশে প্রকৃতির সবটুকু উদারতায় নিজেকে পরিপূর্ণ করতে থাকে কিশোর মুজিব। প্রকৃতির কাছ থেকে না পেলে কখনোই মানুষ এতটা উদার হতে পারে না।

গ্রাম্য সেই জনপথে যে ছেলেটি একদিন ঘুরে বেড়াত আপন মনে। প্রকৃতির সাথে খেলা করত। আদর করে লোকে তাকে খোকা ডাকতো। সেই হলেন সহস্র বছরে শ্রেষ্ঠ বাঙালী।

প্রকৃতির টানেই তিনি বার-বার ছুটে যেতেন গ্রামে। যেখানে আছে তাঁর নারি বাঁধা। ভাবতেন বাঙলার প্রতিটি গ্রামের মানুষের কথা। সত্যিই তাদের জীবন বড়ই অবহেলিত।

গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হলেন বালক মুজিব। শিক্ষা জীবন শুরু হলো তাঁর। অনন্ত প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বালক বয়সি থেকেই সদালাপী মিষ্টভাষী ছিলেন তিনি। সবার সাথে তার যেন এক গভীর সম্পর্ক।

রক্তে যার মিশে আছে আলোক উদ্দমতা। তাকে রুখবে কে ? টুঙ্গিপাড়া থেকেই প্রাইমারি পাশ করেন তিনি। তার পর বাবার কর্মস্থল গোপালগঞ্জে চলে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি ভর্তি হলেন গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলে।

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে তিনি ভাবতে থাকেন দেশ নিয়ে। তার অন্তরে ভালবাসা জাগে দেশের দারিদ্রপীড়িত মানুষের জন্য। তাই তার ভাবনায় বার-বার উঠে আসে দেশের কথা, মানুষের কথা।

সেই স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি ভাবতেন ইংরেজ দুঃশাসনের কথা। কি করে মুক্ত হবে এই দেশ এই জাতি। ইংরেজদের দুঃশাসন তাকে নাড়া দিয়েছিল দারুণভাবে।

স্কুল জীবনেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং বই পড়ে-পড়ে জানতেন পৃথিবীর সব বিখ্যাত মানুষের কথা। স্বদেশীদের কথা। দেশের জন্য তাদের আত্মত্যাগের কাহিনী। সে সব পড়ে-পড়ে তিনি বিমোহিত হতেন।

দেশের জন্য, মানুষের আত্মত্যাগের কথা ভেবে দেশের প্রতি গভীর সম্মোহনীয়তায় ভরে দিতে পেরেছিলেন নিজেকে। ক্ষুদিরাম বসু, বিপ্লবী বসন্তকুমার বিশ্বাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, মাষ্টার দা সূর্যসেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বাঘা যতিন, প্রফুল্ল চাকীর মতো আরো বহু বিপ্লবীদের কথা জেনে-জেনে নিজেকে দেশের জন্য যেন গড়ে তুলেছেন নতুন রূপে। স্বদেশী আন্দোলনের আত্মত্যাগি বহু নেতাদের আত্মকথা তাকে এগিয়ে নিয়েছে বহুদূর। সেই নবযৌবনে প্রথম আলোয় নিজের অলক্ষেই হয়তো নিজেকে মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিতে শপথ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

মানুষের জন্য কাজ করতে ভাল লাগতো তার। কারো জন্য কিছু করার মাঝেই যেন তাঁর সুখ। নিজেকে উজার করে দিয়ে যেন সুখ পেতেন তিনি। তাঁর অন্তর ভরে উঠতো মানুষের ভালবাসায়। বাঙলার বেদনায় কেঁদে উঠতেন তিনি।

তখন থেকেই মনেপ্রাণে স্বদেশীদের ভালবাসতেন তিনি। স্বাধীনতা তার রক্তে। স্বাধীনতাকামি মানুষ তার কাছে অতি প্রিয়।

দুখি মানুষের কথা ভেবেই স্কুল জীবনে তিনি জড়িয়ে পড়েন সামাজিক কর্মকান্ডে। সেই পথ ধরেই রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তখন তিনি অনুভব করলেন মানুষের উন্নয়নে, দাবি আদায়ের কথা বলার প্লাটফর্ম হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দল।

একজন ধনী ব্যক্তি হয়তো তার অর্থ ব্যয় করে কিছু মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান করে একটি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারে। নির্দিষ্ট কোন একটি ভাল কাজ করতে পারে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে। কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতা একটি জাতিকে নিয়ে যেতে পারে অন্ধকার থেকে আলোর পথে। পুরো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে একজনই।

আমি তথাকথিত হিংসাপরায়ণতার রাজনৈতিক কোন কৌশলের কথা বলছি না। অহিংসা পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক দলের কথা বলছি। যা ছিল শেখ মুজিবের অন্তরে।

স্বাধীনতার সংগ্রামে এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশের সর্ব শ্রেণীর মানুষ। যার শক্তি ছিল, সে গিয়েছিল যুদ্ধে, যার শক্তি নেই সে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের। দেশের মা-বোনরা হয়েছে নির্যাতিত নিগৃহীত। দেশের সেই ক্লান্তি লগ্নে স্বাধীনতা বিরোধীও ছিল কেউ-কেউ।

দেশ স্বাধীন হবার পর তাদের ক্ষমা করে পরম উদার ও অহিংসার পরিচয় রেখে গেছেন তিনি।

১৯৪২ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার পর তিনি চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। তার পর বেকার হোষ্টেলে থেকে চলতে লাগলো তাঁর পড়ালেখা।

এর কিছুকাল পূর্বেই তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিজের জীবনের সাথে জড়িয়ে নিলেন এক বিদূষী নারীকে। ১৯৩৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শেখ মুজিবুর রহমান। তার অর্ধাঙ্গিণী হয়ে জীবনের পথ চলার প্রেরণা হয়ে আসেন বেগম ফজিলাতুননেসা।

জীবনে সংগ্রামে জীবন সাথিটি যদি নিজের মতো না হয় তবে কোন কিছুতেই যেন স্বার্থক হওয়া যায় না। সে দিক দিয়ে বেগম ফজিলাতুননেসা ছিলেন অতুলনীয়া। সে যেন গভীর ভাবেই ভালবাসতেন মুজিবকে। হয়তো তার চেয়েও বেশি ভালবাসতেন দেশকে। তাইতো দেশের জন্য শেখ মুজিবের কোন কাজেই কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াতেন না বেগম ফজিলাতুননেসা। নিজে কষ্ট করে হলেও অসীম উৎসাহ দিতেন মুজিবকে।

বেগম ফজিলাতুননেসা। বাঙলার ঘরে ঘরে তাঁদের মতো নারী আছে বলেই দেশটা স্বাধীন হয়েছিল মাত্র ন'মাসে। তাদের আত্মত্যাগের কথা বাঙালীর অন্তরে রবে সহস্র কোটি বছর। যতদিন বাঙলা থাকবে। মানুষ বাঙলা ভাষায় কথা বলবে। মা বলে ডাকবে। ততদিন ধরে তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে থাকবেন সবার মনে। বেগম ফজিলাতুননেসার উৎসাহ আর এগিয়ে যাবার প্রতি শ্লোক মুজিব যেন নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন বার-বার। তাইতো সকল মলিনতা পদতলে মাড়িয়ে তিনি হেঁটেছিলেন বহু দূর। আমরণ কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

সেই স্কুল জীবনেই শের-ই বাঙলা এ কে এম ফজলুল হকের সাথে দেখা হয়েছিল তাঁর। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে আসেন ফজলুল হক। তখন তিনি বাঙলার প্রধানমন্ত্রী। সেই স্কুল জীবনেই শেখ মুজিব ফজলুল হকের সম্মুখে তুলে ধরেন স্কুলের সমস্যাগুলি। মূলত সেই থেকেই শুরু। যিনি স্কুলে পড়েই ভাবতেন মানুষের সমস্যা নিয়ে। তিনি তো অভ্রভেদী হয়ে হিমালয়ের চূড়া ছুঁয়ে দেখবেনই।



আত্ম স্ফুরণ

বিধাতার এই ধরণীতে এমন বহু মানুষ আছেন যারা সাধারণের চেয়ে ভিন্ন। লোভ-মোহ-হিংসা কখনোই গ্রাস করে না তাদের। বরং অন্তরের পবিত্রতা, সরলতা, ভালবাসা দিয়ে হৃদয়ের সকল রিপু বিনষ্ট করে নিজেকে নিয়ে চলে সুন্দর কল্যাণকর কোন পথে। স্বার্থহীন কাজ করেন মানুষের জন্য।

আলোর পথে চলতেই তাদের ভাল লাগে। সাধারণের সংকীর্ণ ইন্দ্রজালিক মোহ ভেদ করে তাঁদের বিচরণ অনন্তের পথে। যেখানে মানুষ মানুষের জন্য। নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবার সাধ মধুর। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা কল্যাণের পরম পথ।

এই সব গুণের সংমিশ্রণে মহান মানুষের মধ্যে সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু। ছাত্র জীবন থেকেই দৃঢ়তার সাথে একটি প্লাটফর্ম বেছে নিয়ে তিনি কাজ করতে থাকেন মনোযোগের সাথে। নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবার সবটুকু মধুরতা পেতে থাকেন তিনি। সমস্ত কুসংস্কার দূর করে মানুষের জন্য কাজ করে যেতে লাগলেন তিনি।

১৯৪৩ সালে রাজনীতির সাথে পুরোপুরি ভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গীয় মুসলীম ছাত্রলীগের সাথে কাজ শুরু হলো তার। দিন-রাত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি। দলের কাজের সাথেই দেশের জন্য কাজ করার সুযোগ হলো তাঁর। তার পর আর পিছনে ফিরতে হয়নি তাকে। তাঁর যোগ্যতাই তাকে বসিয়েছে তাঁর যোগ্য আসনে।

১৯৪৪ সালে শুরু হলো বাঙলায় মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিল। এটা তার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। নিজেকে প্রকাশের একটি বড় পথ। সেখানে কাউন্সিলারদের সরাসরি ভোটে তিনি নির্বাচিত হলেন ফরিদপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক পদে।

তাঁর কাজের পরিধি বাড়তে থাকলো ধীরে-ধীরে। পরিচিত হতে থাকলেন মানুষের মাঝে। দলের জন্য কাজ করতে লাগলেন তিনি। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের আন্দোলন হলো বৃটিশ বিরোধী। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার জন্য দেশের জন্য জীবন দিতে একটুও কুণ্ঠিত হননি তিনি।

এখানে বলে রাখা দরকার কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ গঠনে এদেশের মানুষের ভূমিকা। এবং প্রথম দুটি রাজনৈতিক দলের আত্ম-প্রকাশ। এতে ভারতীয় নতুন পথের সূচনা।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজদৌল্লার অপ্রত্যাশিত পতনের সূত্র ধরেই ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজ কোম্পানির হাতে। তার পর প্রায় একশ' বছর ধরে চলতে থাকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লুট-পাট আর প্রহসনের রাজত্ব। তখন থেকেই মানবেতর জীবন যাপন করতে শুরু করলো মানুষ। নিজের মাতৃভূমিতেও স্বীকার হতে হচ্ছে, দুঃশাসন, শোষণ, নির্যাতনের। নির্বাক সইতে হয়েছে অনেক যন্ত্রণা। নীল চাষের মতো হাজারো অত্যাচার সইতে হয়েছে মানুষকে। খাজনার দায়ে বা কোন ক্ষুদ্র অপরাধেই বিচারহীন হত্যা, লুণ্ঠন এবং চাবুকের আঘাতে রক্তাক্ত হওয়া ছিল কৃষকদের নিত্য দিনের ঘটনা। কিন্তু উপায় ছিলনা মুখ খুলে প্রতিবাদ করার। অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হতো অন্ধকার কারাগারে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেনের রাণী ভিক্টোরিয়া এলেন ভারতের সম্রাজ্ঞী হয়ে। অবসান ঘটল কোম্পানী শাসনের। কিন্তু পরির্বতন হলো না ইংরেজ দুঃশাসনের। ততদিনে ভারতের কিছু মানুষ উন্নত হয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে। তারা তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে প্রস্তুত। নিজের দেশের মাটিতে ভিনদেশীদের দ্বারা এভাবে বঞ্চিত, নিস্পেষিত কিছুতেই মানতে পারেন নি তারা। তারই ধারাবাহিকতায় বৃটিশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলো কেউ-কেউ। কিন্তু সেই প্রতিবাদ ছিল বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনার মতো। তাই দাবি দাওয়া উত্থাপনের জন্য ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সংগঠিত হলো একটি রাজনৈতিক সংগঠন। সেই সংগঠনের নাম দেয়া হলো, "জাতীয় কংগ্রেস।" এই সংগঠনের নেপথ্যে ছিলেন এক ইংরেজ সিভিলিয়ান, 'এ্যালান অকটেডিয়ান হিউম'।

এই সংগঠনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বোম্বে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশা ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং বৃটিশ সরকারের সাথে ভারতীয়দের সম্পর্কের উন্নতি।

কালক্রমে এই সংগঠনটিই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। সেই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা হলেন, দাদাভাই নৌরাজি, বদর উদ্দীন তায়েবজি, বালগঙ্গাধর তিলক, বল্লভ ভাই প্যাটেল, গোপালকৃষ্ণ, রাজা গোপাল আচারী, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু, লালা লজপত রাত্ত, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, খান আবদুল গাফফার খান, মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ, জওহর লাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস আরো অনেকেই।

হিন্দু মুসলিমদের বৈরিতা ভারতে বহু দিনের সমস্যা। সেই ব্যাপারটা ভালই বুঝতে পারতেন বৃটিশরা। তাই কখনো-কখনো সেই সুযোগটাই গ্রহণ করতেন ইংরেজ সরকার। তাছাড়া কংগ্রেসের নেতৃত্বে মুসলিমদের চেয়ে হিন্দুদের প্রভাব ছিল বেশি। এতে কখনো-কখনো হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিত দারুণ অসন্তোষ। তারই সূত্র ধরে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকায় বসে গঠন করলেন,"নিখিল ভারত মুসলিম লীগ।" তখন জিন্নাহ সহ আরো অনেক মুসলিম নেতারা যোগ দিলেন এই দলে। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলো বৃটিশ স্বৈরশাসনের প্রতিবাদ ও মুসলমানদের পূর্ণ জাগরণ। এর পর ভারতে সূচনা হলো আরো অনেকগুলো সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাদের সকলেরই ভুমিকা রয়েছে। দেশকে শত্রু মুক্ত করতে সকলেই কাজ করছেন এক সাথে। কেউ চেয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে। কেউ আবার রাজনৈতিক ভাবে মিছিলে আর শ্লোগানে। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল একটাই, দেশকে স্বাধীন করা।

কলকাতায় মুসলিম কলেজে ব্যাপক সারা জাগান শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তার সাথে বঙ্গিয় ছাত্র সংগঠনের জন্য কাজ করে যেতেন। বাঙলার কথা ভেবেই ছিল তাঁর সকল কর্মকান্ড।

১৯৪৬ সালে কলকাতার মুসলিম কলেজ ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি হলেন তিনি। তখন মুসলিম কলেজে বিএ অধ্যায়নরত থেকে, কলকাতায় তিনি ছড়িয়ে দিতে লাগলেন তার রাজনৈতিক কর্মকান্ড।

পূর্ববঙ্গের ছেলে হয়ে কলকাতায় তার এই বিচরণ সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি তার অদম্য ইচ্ছে শক্তি দিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগের একজন অন্যতম নেতা রূপে পরিচিতি লাভ করলেন সেখানে।

সে বছরের শেষের দিকে পুরো ভারত জুড়ে শুরু হলো ব্যাপক আন্দোলন। কংগ্রেস আর মুসলিমলীগ এক হয়ে নামলো রাজপথে। ব্রিটিশদের তাড়াতেই হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। এই একটি শ্লোগানে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো সকলেই। সকল সাম্প্রদায়িক, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক এবং বৈপ্লবিক দলগুলো।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের। কখনোই থেমে থাকেননি তিনি। একটির পর একটি আন্দোলনের মধ্যে দেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন বাঙলার এই অকুতভয় সন্তান। জীবনে মাথা নত করতে শেখেননি তিনি। যেন হারতে জানেন না। অন্যায় করতে জানেন না, সাধারণের কথা ভেবে জীবন দিতেও যেন কুণ্ঠিত নন তিনি।

১৯৪৭ সালে কলকাতা মুসলিম কলেজ থেকে বি এ ডিগ্রি নিয়ে চলে এলেন দেশে। ১৯৪৭ থেকে পুরো ভারত জুড়ে তুমুল আন্দোলনের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলো ব্রিটিশ বাহিনী।

অনেক ত্যাগের পর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে হলো দু'টি রাষ্ট্র। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে হলো পাকিস্তান এবং অন্য এলাকাগুলো রইল ভারত ডমিনিয়নের অন্তর্ভূক্ত।

পাকিস্তান পেলো সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বেলুচিস্তান এবং পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববঙ্গ। তখন পাকিস্তান বিভক্ত হলো দু'টি অঞ্চলে। ভারতের পশ্চিমে চারটি প্রদেশ নিয়ে হলো পশ্চিম পাকিস্তান। এবং ভারতের পূর্বে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ হলো পূর্ব-পাকিস্তান। হাজার মাইলের চেয়েও বেশি দূরত্ব দুই পাকিস্তানের মধ্যে আর মধ্যখানে রইল ভারত।

দেশ ভাগের পর নতুন করে কাজ শুরু হলো স্বাধীন দেশে। তখন ১৯৪৭ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন হলো দেশ। ব্রিটিশরা চলে গেলেন কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ যেন কোথায়ও নেই। সর্ব ক্ষেত্রেই বাঙালী স্বীকার হতে থাকলো নির্যাতন আর বৈষম্যের। এই জন্যই কি ব্রিটিশদের তাড়ানো হলো দেশ থেকে। কত রক্ত, কত জীবন, কত কান্না মধ্যে দিয়ে, কত মায়ের বুক খালি করে, প্রায় অর্ধ

শতকেরও বেশি সময় ধরে সংগ্রাম করে নিঃস্পেষিত হয়ে এসেছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ফল কি পাচ্ছে মানুষ।

বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছিল দীর্ঘ দিন ধরে। দেশ ভাগের পরও কোন ব্যতিক্রম হলো না তার। কোন রকম পরিবর্তন হলো না তাদের ভাগ্যের।

নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কষ্টে মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো শেখ মুজিবুর রহমানের। তাদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বার-বার কারা বরণ করতে হয়েছে তাঁকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায় নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন তিনি। ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন সফল করার লক্ষে নিজের শক্ত হাতে নেতৃত্ব দিলেন তিনি।

দুর্জয় সাহসী এই নেতা রাজ পথেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়কে কেন্দ্র করে গ্রেফতার হলেন তিনি। এবং পাক সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করলেন তাকে। কিন্তু পাক সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে।

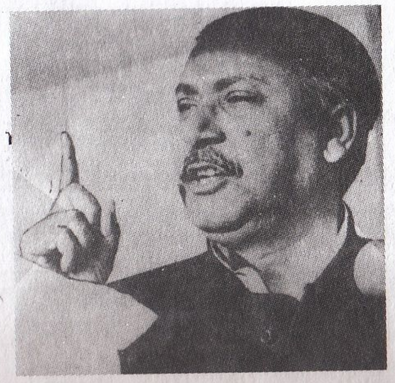
কোন জেল-জুলুমই থামিয়ে রাখতে পারেনি তাকে। এগিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। পূর্ব বঙ্গের মানুষের কথা ভেবে এক মুহূর্ত স্থির থাকেননি তিনি।

শেখ মুজিব দেখলেন প্রতি কাজেই বৈষম্যতার স্বীকার হচ্ছে বাঙালীরা। শুরু থেকেই পশ্চিমাদের একপেশে মনোভাব। বড় বিচলিত করে তোলে বঙ্গবন্ধুকে।

১৯৪৮ সালে ৪ জানুয়ারী গঠন করা হলো পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। সেদিন পুরো ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফজলুল হক হলে এসে জমা হলো ছাত্র-ছাত্রী। সেখানে বিশাল এক ছাত্র সমাবেশের মধ্যে দিয়ে গঠন করা হলো পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ।

তখন পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যে ক'জন নেতা ছিলেন তার মধ্যে শেখ মুজিব অন্যতম। মাওলানা ভাসানীর খুব কাছের একজন হয়ে তার সান্নিধ্য লাভে সুযোগ পেলেন বঙ্গবন্ধু।

শুধু মাওলানা ভাসানীই নয় এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাথে ছিল তার গভীর সম্পর্ক। তাদের সংস্পর্শে এসে রাজনীতি করার সুযোগ পান তিনি। ছাত্র জীবন থেকেই রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু।



প্রাণের ভাষা

দেশ ভাগের পর পরই শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা ভাসানী এবং পূর্ববঙ্গের অন্য সকল নেতাদের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠন হলো, 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাহিত্য-সংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে চলতে থাকলো বাঙলার সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা এবং বাঙলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জোর প্রচেষ্টা।

এই তমুদ্দুন মজলিশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাঙলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির জন্য দাবী জানানো হয়। তার পর অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়াকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হলো, 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।'

বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী মোটেই অযৌক্তিক ছিল না পূর্ব-পাকিস্তানের। বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দেয়া এটা যেমন ছিল রাঙালীর প্রাণের দাবী তেমনি এই দাবী ছিল পুরোপুরি যৌক্তিক। যেখানে পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষ কথা বলে বাঙলায়, সেখানে বাঙলা রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু এই দাবীকে বিন্দু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে, কোন রকম আলোচনা না করে বর্বর জাতীগোষ্ঠিদের মতো ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক শিক্ষা সম্মেলনে বাঙলাকে উড়িয়ে দিয়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

এই খবরে পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে দেখা দিল চরম অসন্তোষ। কেউ মানতে রাজি নয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে। ধীরে-ধীরে বৈষম্য বাড়তে লাগলো দুই-পাকিস্তানের মধ্যে।

পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য না ভেবে পাকিস্তানের একটি কলোনী ভাবতে লাগলো পশ্চিমারা। না হলে শুরু থেকে দুই পাকিস্তানের

মধ্যে কেন শুরু হবে এই বৈষম্যতা। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্য থেকে শুরু করে স্বর্ণ, কাপড় এমনকি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দেখা দিল দারুণভাবে অসাম্যতা।

তখন রাজপথে থেকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললেন শেখ মুজিবুর রহমান। সলিমুল্লাহ হলের ভিপি আবদুর রহমান চৌধুরী, কার্জন হলের ভিপিসহ সকল ছাত্রনেতা নেমে এলো রাজপথে। শুরু হলো একটির পর একটি কর্মসূচি।

রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবিতে তমুদ্দুন মজলিসের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হলো সকল কর্মসূচি। তখন রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীতে রাত দিন কাজ করে গেলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালী।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকেই শুরু হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ড। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশাল সমাবেশের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষদের জানিয়ে দেয়া হলো, ২৩ ফেব্রুয়ারী শুরু হবে পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন। সেই অধিবেশনে যোগ দেবেন পূর্ব-বাঙলার গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সেখানে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব রাখবেন তিনি।

তার প্রস্তাব যদি পাকিস্তান সেন্ট্রাল গভার্মেন্ট না মেনে নেন, তাহলে রাজ পথের সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী আদায় করতে হবে। এক সাথে আন্দোলন করতে হবে আমাদের।

সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নেতা কর্মীদের বক্তব্য এবং যে সকল কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লো সারা দেশে। তখন দেশের সর্ব স্তরের মানুষ এসে যোগ দিলেন এই আন্দোলনে।

১৯৪৮ সাল। ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখে করাচীতে শুরু হলো পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশন। সেই অধিবেশনে যোগ দিলেন পূর্ব-বাঙলার গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অধিবেশনে তিনি প্রথম দাবী জানালেন বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বীকৃতি দেবার।

সে কথা শুনে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ পশ্চিমা প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমন কি পূর্ব-বাঙলার প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও ছিলেন তাদের পক্ষে।

গণপরিষদের অধিবেশন চলাকালীন সময় বিভিন্ন কথার পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান মি. দত্তকে বলেন,

Pakistan is a Muslim state and it must have its Language Franca-The Language of Muslims. The Mover Mr. Datt is a congress member. He should realize that Pakistan has been created because of the demand of hundred milion Muslims of the Sub-Continent. The Language of hundred milion Muslims is Urdu and that Language can only be taken as state Language.

মি. দত্ত বলেন, উর্দু শুধু মুসলমানদের ভাষা নয়। বাঙলা পূর্ব বাঙলার মুসলমানদের ভাষা। পাকিস্তানের ৫৬% মানুষের ভাষা বাঙলা। উর্দু জানা না থাকলে কাউকে অমুসলিম বলার কোন যুক্তি নেই।

তার জবাবে জিন্নাহ বলেন,

Let me make it very clear to you that the state Language of Pakistan is going to be Urdu and no other Language. Anyone who trics to mistead the People is really the enemy of the state. Without can remain tied up solidly together and function.

মি. দত্ত বলেন, প্রধানমন্ত্রী কি বলতে চান যে, যারা উর্দু চাইবে না তারা দেশের শত্রু ? তাহলে পূর্ব-পাকিস্তান কি একটি দুশমনের দেশ ? কেননা, পূর্ব বাঙলায় প্রায় সকলেই রাষ্ট্রভাষা উর্দুর বিপক্ষে। এই কারণে একটি বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যে দায়ী কে ?

পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী নাকচ করে দেওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব-পাকিস্তান। পূর্ব-বাঙলার প্রতিনিধিদের কথা কোন রকম বিবেচনায় না নিয়ে যা খুশি তাই করবে তারা, তা কখনোই মেনে নেবে না পূর্ব-বাঙলার মানুষ। উর্দুই হবে মুসলমানদের ভাষা আর বাঙলা অমুসলিমদের ভাষা এই বর্বরোচিত কথার জোর প্রতিবাদ জানালো পূর্বপাকিস্তানের মানুষ।

বিধাতার সৃষ্টি সকল ভাষা বা সকল দেশেই সকল ধর্ম বা সকল ভাষাভাষী বাস করতে পারে। কেউ যদি বলে ইংরেজিতে কথা বললেই সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে মুসলমানদের শত্রু। আবার আরব বিশ্বে বাস করতে পারবে না কোন খ্রিষ্টান। এরকম কথা সস্তা বর্বরতা ও ধর্মীয় প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঙ্গালীর প্রাণের দাবী রাষ্ট্রভাষা বাঙলা। আর এটা মোটেই অযৌক্তিক দাবী নয়। যেখানে পুরো পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% মানুষ বাঙলায় কথা বলে, সেখানে এই দাবী সঠিক।

তার কয়েক দিন পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের সকল রাজনৈতিক দল সাংবাদিক, কবি, শিল্প, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানালেন একযোগে। এরই ধারাবাহিকতায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমর্থনের প্রতিবাদে মার্চের দিকে ডাক এলো আন্দোলনের। সারা পূর্ববঙ্গের সকল স্কুল কলেজে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নেতা কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিলেন।

১৯৪৮, মার্চের দুই তারিখে পূর্ববঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমন ও তমুদ্দুন মুসলিমের সমন্বয়ে পূর্ণ গঠন হলো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদের মাধ্যমে প্রস্তাব রাখা হলো রাঙলা এবং উর্দু দুই-ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই প্রস্তাবের অন্যতম দাবী পূর্ব বাঙলার অফিস আদালত এবং সকল শিক্ষার মাধ্যম হতে হবে বাঙলাভাষা।

১১ই মার্চে সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেয়া হলো। পূর্ব বঙ্গের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট, রাষ্ট্রভাষা বাঙলার পক্ষে আলোচনা সভা, সেক্রেটারিয়েটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। এই সব কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ শুরু হলো।

১১ই মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলো রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীতে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল। ঢাকা যেন মিছিলের নগরি। সেই আন্দোলনের বলিষ্ট ভূমিকা ছিল দেশ প্রেমিক বঙ্গবন্ধুর।

রাজপথে মিছিল নিয়ে বের হতেই শুরু হলো পুলিশি হামলার। প্রথমে লাঠিচার্জ তার পর টিয়ার গ্যাস মেরে ছত্রভঙ্গ করা হলো মিছিল। মিছিলে আহত হলো বহু ছাত্র-জনতা। গ্রেফতার করা হলো অনেককেই। চির দিনের মতো বাঙলার মুখ বন্ধ করে দিতে চাইল ওরা। বাঙলার প্রাণের দাবী যেন কিছুতেই মানবে না পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠী।

কিন্তু পশ্চিমাদের সেই বর্বর হামলার প্রতিবাদে গর্জে উঠলো অভ্রভেদী শেখ মুজিবুর রহমান। পুলিশের এই নগ্ন হামলার প্রতিবাদে স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠলেন তিনি। তখনি আবার পথসভা করে ঘোষণা দেয়া হলো ১২, ১৩, ১৪ই মার্চে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হবে ধর্মঘট।

তারই প্রেক্ষিতে ১৯শে মার্চ ঢাকায় আসে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তার আগমনে সংগ্রাম পরিষদের সাথে আপষ করতে বাধ্য হলো প্রাদেশিক সরকার। পূর্ব-বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন বৈঠকে বসলেন সংগ্রাম পরিষদের সাথে। তখন সমস্ত বাঙালীর মুখপাত্র হয়ে সরকারের কাছে সাত দফা পেশ করলেন সংগ্রাম পরিষদ।

পূর্ববঙ্গ পরিষদে চলিত অধিবেশনে বাঙলাকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ভাষা এবং সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তাব পাশ করতে হবে।

বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে।

আন্দোলন চলাকালে গ্রেফতারকৃত সকল রাজবন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে।

আন্দোলনে সমর্থনদানকারী পূর্ববঙ্গ এবং কলকাতায় প্রাকাশিত সকল পত্রিকার উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

পুলিশ এবং দায়িত্বে নিয়োজিত কমার্ডিং অফিসারগণের সকল নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন একটি তদন্ত দল গঠন করতে হবে।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলের উপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং কারও বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

সরকারিভাবে ঘোষণা করতে হবে যে, এ আন্দোলনের গভীরভাবে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত। প্রেস নোটিসের মাধ্যমে এবং প্রধানমন্ত্রীকে তা ঢাকা বেতার থেকে তার ভাষণে বলতে হবে।

এই সাত দফার পরেও আরো একটি দফা প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে লেখাতে বাধ্য করা হলো, 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনার পর আমি (প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন) এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই আন্দোলনে রাষ্ট্র দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি।

অবশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ১৯শে মার্চে বিকেলে এক নাগরিক সংবর্ধনায় ভাষণ দেন মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ। তার কদিন পর ২৪শে মার্চে ঢাকা কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি। সেখানে তিনি বলেন, Urdu and only Urdu shall Language of Pakistan. এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানিয়ে সকল ছাত্ররা তখনি বলে উঠলো, ধর-ধর।

প্রধানমন্ত্রীর নাকোচে, সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে থেকে চলতে থাকে বিভিন্ন আলোচনা। এবং বিভিন্ন সংবাদ পত্রেও লেখালেখি হতে থাকে এই বিষয়ে। কিন্তু এতে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করে না পশ্চিমারা।

তারপর একটির পর একটি আন্দোলন করতে লাগলো পূর্ব-বাঙলার ছাত্র-জনতা। তখন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে চলতে লাগলো আন্দোলন। রাষ্ট্র ভাষা বাঙলা চাই। এই শ্লোগান ধ্বনিত হতে লাগলো আকাশ বাতাশে।

কিন্তু বাঙালীর প্রাণের এই দাবীতে কোন সাড়া দিল না পশ্চিমারা। তখন থেকেই বাঙলার প্রতিটি মানুষ জেনে গেল পশ্চিমারা কখনোই মেনে নেবেন না বাঙলার মানুষের কোন সঠিক দাবী। কোন অধিকার।

১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের টাঙ্গাইল আসন শূন্য হলে, উপ-নির্বাচনে অংশ নেন মাওলানা ভাসানী। সেখানে খাজা নাজিমুদ্দিনের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন জমিদার খুর্‌রম খান পান্নী। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের খুবই প্রভাবশালী নেতা। ভাসানীর এই নির্বাচনে প্রাণপণে কাজ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

খুর্‌রম খান পান্নী পরাজিত হলে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন মাওলানা ভাসানী। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিনের গভীর ষড়যন্ত্রে বাতিল বলে ঘোষণা হলো এই উপ-নির্বাচন। এর প্রেক্ষিতে মাওলানা ভাসানীর পক্ষে আন্দোলন শুরু করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙলার উপর যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন বাঙলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তান।

কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন যেন আরো কঠোর হলেন। ১৯৫০ সাল অবধি মাওলানা ভাসানী যেন কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করতে পারে এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো।

পশ্চিমাদের গণতন্ত্র বিরোধী এই ষড়যন্ত্রকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৯ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী ঢাকায় ফিরে এলে মুসলিম

লীগের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন দল গঠনের উদ্যোগ নেন মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

সেই উদ্দেশ্যে সারাদেশব্যাপী চলতে থাকে ব্যাপক প্রচারণা। তারই ধারাবাহিকতায় নেতা, কর্মী এবং বিপুল সমর্থনে ১৯৪৯ সালের ১৩ই জুন ঢাকায় গঠন করা হলো 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল।

দলের সাভাপতি হলেন মাওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক সামসুল হক এবং যুগ্ন-সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। এই নতুন দলটি খুলে দিল মানব মুক্তির নতুন ধারা। খুবই দ্রুত প্রসার বিস্তার করতে লাগলো দল। এবং দলটির কাজ হলো সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলা।

বাঙলার অবহেলিত মানুষের পক্ষে কাজ করতে লাগল আওয়ামী মুসলিম লীগ। বাঙলার প্রতিটি গ্রামে-গ্রামে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করতে নিজেকে একটি দিনের জন্যও স্থির রাখেননি শেখ মুজিবুর রহমান। ধীরে-ধীরে বাঙ্গালীর অন্তরে ভিতরে জায়গা করে নিলেন এই মহাবীর বাঙ্গালী। তার নেতৃত্বে সুসংগঠিত হতে থাকলো পুরো বাঙালী জাতি।

১৯৫০ সাল। সারাদেশে সাধারণ নির্বাচনের জোয়ার। মুসলিম লীগের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করছে আওয়ামী মুসলীম লীগের নেতারা। এরই মধ্যে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রসার বিস্তার করেছে আওয়ামী মুসলিম লীগ। দেশের সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষে। যেন বিশাল এক গণজোয়ার আওয়ামী মুসলিম লীগের।

নিজ জেলা গোপালগঞ্জ আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রার্থী হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলো, মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামান।

মুসলীম লীগের প্রশাসনিক চাপ আর বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে এক রকম পরীক্ষা ছিল ১৯৫০ সালের নির্বাচন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালে ২৩শে মার্চে সংগঠিত হলো সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনে মুসলিম লীগের ওয়াহিদুজ্জামানকে ১৩ হাজার ভোটে পরাজিত করে গোপালগঞ্জ আসনে নির্বাচিত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙলার মানুষের জয় হলো সেদিন।

কিন্তু স্বার্থলোভী ক্ষমতা পিপাসু পশ্চিমারা মেতে উঠলো গভীর ষড়যন্ত্রে। তারা বুঝে নিল বাঙলার মুখ বন্ধ করতে হলে প্রথমে স্তব্ধ করতে হবে বিদ্রোহী সেই কণ্ঠ। কখনোই গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল না পশ্চিমারা। তাই

গণতন্ত্রকে হত্যা করতেই ছিল তাদের সকল ষড়যন্ত্র। আর বাঙলার মানুষকে চিরদিন তাদের দাস করে রাখবে। পাক সরকার চক্রান্তে মেতে উঠলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে।

তারই ধারাবাহিকতায় আগ্রাসী পাক সরকারের রোসানলে পড়তে হলো শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯৫০ সালে গ্রেফতার হলেন তিনি। ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে আটক রাখা হলো তাকে।

এদিকে পুরো পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে শুরু হলো বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভ। জেলে বসে খাচায় বন্দি বাঘের মতো ছটফট করতেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙলার উপর এই অমানুষিক নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে তাকে।

কারাগারে থেকেই অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন তিনি। এবং গোপনে যোগাযোগ করতে লাগলেন জেলের বাইরে সব নেতা কর্মীদের সাথে হিমালয়ের মতো দৃঢ়তা নিয়ে মাতা নীচু করেন নি কখনো। মাথা উচু করে সেই কঠিন দিনগুলো পার করছেন তিনি। তবুও মাথা নীচু করেনি একটি বারের জন্যও। তিনি বিশ্বাস করতেন মৃত্যু বিধাতার হাতে। তাই মৃত্যুকে ভয় করে অন্যায়ের সাথে আপস করার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

জেলে বসেই শেখ মুজিবুর রহমান রাখতেন বাহিরের সকল খবরা-খবর। এরই মধ্যে প্রায় দেড় বছর কেটে গেল কারাগারে তাঁর। কোনভাবেই মুক্তি পেলেন না তিনি।

১৯৫২ সাল। বাঙলার বুকে রক্ত ঝরা গৌরব গাঁথা এক অধ্যায়। কে পারে ভাষার জন্য জীবন দিতে। শুধু বাঙালী ছাড়া। মায়ে মুখের ভাষার জন্য জীবনকে অতি তুচ্ছ ভাবতে পারে শুধু বাঙালীরাই।

বঙ্গবন্ধু কারা রুদ্ধ। পুরো বাঙলার মানুষ এখন রাজপথে। কি দুঃসহ এক বেদনা নিয়ে ছটফট করতেন তিনি। বাঙলার মানুষের উপর নির্বিচারে এই নির্যাতন। দিনে-দিনে বড় অসহ্য হয়ে উঠেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাই সেখানে বসেই অনশন করতেন তিনি।

১৯৫২ সালে ২৬ জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে হলো বিশাল জনসভা। সেখানে ভাষণ দেন খাজা নাজিমউদ্দীন। সেখানে উচ্ছুক জনতার সম্মুখে তিনি বলেন, 'জাতির জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আজ বেঁচে নেই, লিয়াকত আলীও সাহেবও মারা গেছেন। তাদের ইচ্ছে ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। তাই আসুন আমরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা

করে তাদের অন্তিম ইচ্ছের উপর শ্রদ্ধা জানিয়ে কৃতজ্ঞ হই; দৃঢ়সংহতির উপরে পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠিত করি। তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করা রাষ্ট্রদ্রোহীতার সামিল।'

তার এই বক্তব্যে প্রচন্ড ভাবে নাখশ হন সমবেত জনতা। এতে আরো বেশি অসন্তোষ দেখা দেয় পূর্ব-বঙ্গে।

তিনি যখন পূর্ব-বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তার দেয়া কথা পরিস্কার অসমর্থন করলেন তিনি এই ভাষণের মাধ্যমে। তিনি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। এতে আন্দোলন আরো বেশি জোরালো হতে শুরু করল।

৩০শে জানুয়ারী ১৯৫২। মহাসমাবেশের মাধ্যমে গঠন করা হলো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদে আওয়ামী মুসলীম লীগ, খেলাফতে রাব্বানী পাটি, সাপ্তাহিক সৈনিক, তমুদ্দুন মজলিস, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ, রিক্সা ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ, সিভিল লিবার্টি কমিটি, সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদ, ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদ, ঢাকা মেডিকেল হল ছাত্র সংসদ, পূর্ববঙ্গ কর্মী শিরিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও নিখিল পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এই সর্বদল থেকে মোট ২৮ জন নিয়ে একটি শক্তিশালী সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা হয়।

এই কমিটি গঠনের পর আন্দোলনের শুরু হয় নতুন রূপে। বিক্ষোভে ফেটে পরে পুরো জাতি। বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবী যতদিন না মানবে ততদিনই চলবে এই আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে কর্মীরা কাজ চালাতে লাগলো দিন-রাত। রাত জেগে দেয়ালে-দেয়ালে চিকা মারা হতে শুরু করে ব্যানার, ফেষ্টুনের গায়ে লেখা রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই।

ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে ঢাকা পরিণত হলো বিক্ষোভের নগরীতে। পুরো ঢাকার সকল স্কুল কলেজ থেকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রী এসে জড়ো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। সেই প্রতিবাদ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বললেন, সংগ্রাম পরিষদের সাথে সরকারের যে চুক্তি ছিল, তা রক্ষা করেননি সরকার। অতএব, আমাদের ভাষার দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলবে। তাই আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীতে দেশব্যাপি পালিত হবে ধর্মঘট।

খুব থমথমে ভাব সারাদেশে। এখন ২১ তারিখের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতা কর্মীরা মিলে শুরু করলো প্রচারাভিযান। এই ধর্মঘট সফল করতেই হবে। সরকারের কাছ থেকে বাধা আসবেই। সব উপেক্ষা করেই আমাদের দাবী আমাদের আদায় করতে হবে। না হলে সারা জীবন আমাদের শোষণ করে যাবে পশ্চিমারা।

এদিকে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমগুলো প্রায় প্রতিদিনই লেখা বের করে পাকিস্তানের এই আন্দোলনের সংগ্রামের কথা। দুই পাকিস্তানের বৈষম্য এখন চোখে লাগার মতো। পশ্চিমাদের সুযোগ বাড়ছে দিনে-দিনে। আর পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে বিভিন্নভাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হতে শুরু করে চাকরী ব্যবসা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দারুণভাবে শোষিত হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। দেশ চালাচ্ছে তাদের ইচ্ছে মতো। কারো কোন দাবী মানতে চাইছে না তারা।

২০ ফেব্রুয়ারী দিন-রাত ধরে চলল ধর্মঘটের প্রস্তুতি। সকল স্তরের জনগণকে আহ্বান জানানো হলো ধর্মঘট সফল করার লক্ষে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও চলছে চাপা ক্ষোভ।

২১ তারিখে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে ছাত্র-জনতার ঢল। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সকলেই এসে জড়ো হতে থাকলো ঢাকা ভার্সিটির ক্যাম্পাসে।

এই ধর্মঘট বানচাল করার উদ্দেশ্যে ১৪৪ ধারা জারি করে সরকার। পুলিশ মোতায়েন করা হলো ভার্সিটির বিভিন্ন এলাকাসহ শহরের বিভিন্ন স্পটে। ১৪৪ ধারা কিছুতেই ভাঙতে দেবে না সরকার।

কিন্তু ১৪৪ ধারা কিছুতেই মানবে না বিক্ষুব্ধ জনতা। এর কদিন আগে মওলানা ভাসানীসহ সংগ্রাম পরিষদের অনেক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের রাখা হয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজ করছে থমথমে ভাব। মিছিলের পর মিছিল আসতে শুরু করেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। মুহূর্তেই জনসমুদ্রে পরিণত হলো ভার্সিটির চত্বর। সকল নেতৃবৃন্দর উপস্থিতিতে স্লোগানে-স্লোগানে মুখরিত হতে থাকলো পুরো ক্যাম্পাস। সশস্ত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ।

সেই সব ভারি অস্ত্র আর ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদের চরম ঝর তুলে-তুলে ঝঞ্ঝার ন্যায় স্লোগানে-স্লোগানে, রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই, বাঙলা চাই, ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে চলল মিছিল। আকাশ বাতাস কেঁপে উঠলো বাঙলা ধ্বনিতে।

ছেলেরা প্রথম সারিতে, মেয়েদের রাখা হয়ছে তার পরে। এগিয়ে চলছে মিছিল। বিক্ষুব্ধ পুলিশ শুরু করলো লাঠিচার্জ। তাতেও হার মনলো না বাঙালী বীরেরা। তার পর শুরু হলো ক্যাদানে গ্যাস নিক্ষেপ। সব উপেক্ষা করে এগিয়ে চলছে মিছিল।

মুহূর্তে অকস্মাৎ অশুভ গর্জনে কেঁপে-কেঁপে উঠলো রাজপথ। পশ্চিমা বর্বরদের গুলিতে সঙ্গে-সঙ্গে রাজপথে লুটিয়ে পড়লো কয়েকটি তরুণ তাজা প্রাণ। তখনি নিহত হলো আসাদ, বরকত, সালাউদ্দীন, সালাম, রফিক, জব্বর আরো কয়েকজন। পুলিশের হামলা আর গুলিতে আহত হলো অনেকেই।

মুহূর্তেই ছাত্র হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লো সারাদেশে। সে খবরে তীব্র আন্দোলনে যোগ দিল পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণীর মানুষ। গ্রেফতার করা হলো বহু ছাত্র-জনতাকে। সেই সব জেল জুলুম উপেক্ষা করেও চলতে লাগলো আন্দোলন।

২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রবাসের প্রাঙ্গণে সকাল ৭টায় শুরু হলো শহীদদের গায়েবী জানাজা। জানাযায় যোগ দিলেন হাজার-হাজার মানুষ। সেই বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখে নেতৃবৃন্দ ভাষণ দিয়ে শুরু হলো মিছিল।

আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে স্লোগানে-স্লোগানে ধ্বনিত হতে থাকলো,' রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই,'খুনী নুরুল আমিনের বিচার চাই।'

মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে হাইকোর্ট এবং কার্জন হলে মধ্যবর্তী পথ আব্দুল গণি রোডের দিকে। সেক্রেটারিয়েটের হামলার আশঙ্কায় লাঠিচার্জ আর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগলো পুলিশ বাহিনী। তাতে কোন রকম পিছু না হটে মিছিল চলতে লাগলো সদরঘাট জগন্নাথ কলেজের দিকে। ভিক্টোরিয়া পার্কের সম্মুখে আসার পূর্বক্ষণে আবার পুলিশী হামলার স্বীকার হতে হলো মিছিলটির। এবার লাঠিচার্জ আর টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হলো অনেক নেতাকর্মীকে। পুলিশের নৃশংসতা সহ্য করে কারাবাসে দিন কাটতে হলো দেশ প্রেমিক ভাষাপ্রেমি দুরন্ত অকুতভয় মানুষগুলোর।

সেদিনই শহীদ মিনার গড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন নেতৃবৃন্দ। ২১শে ফেব্রুয়ারী যে স্থানটিতে প্রথম গুলি হয়েছিল সেখানেই হবে শহীদ মিনার।

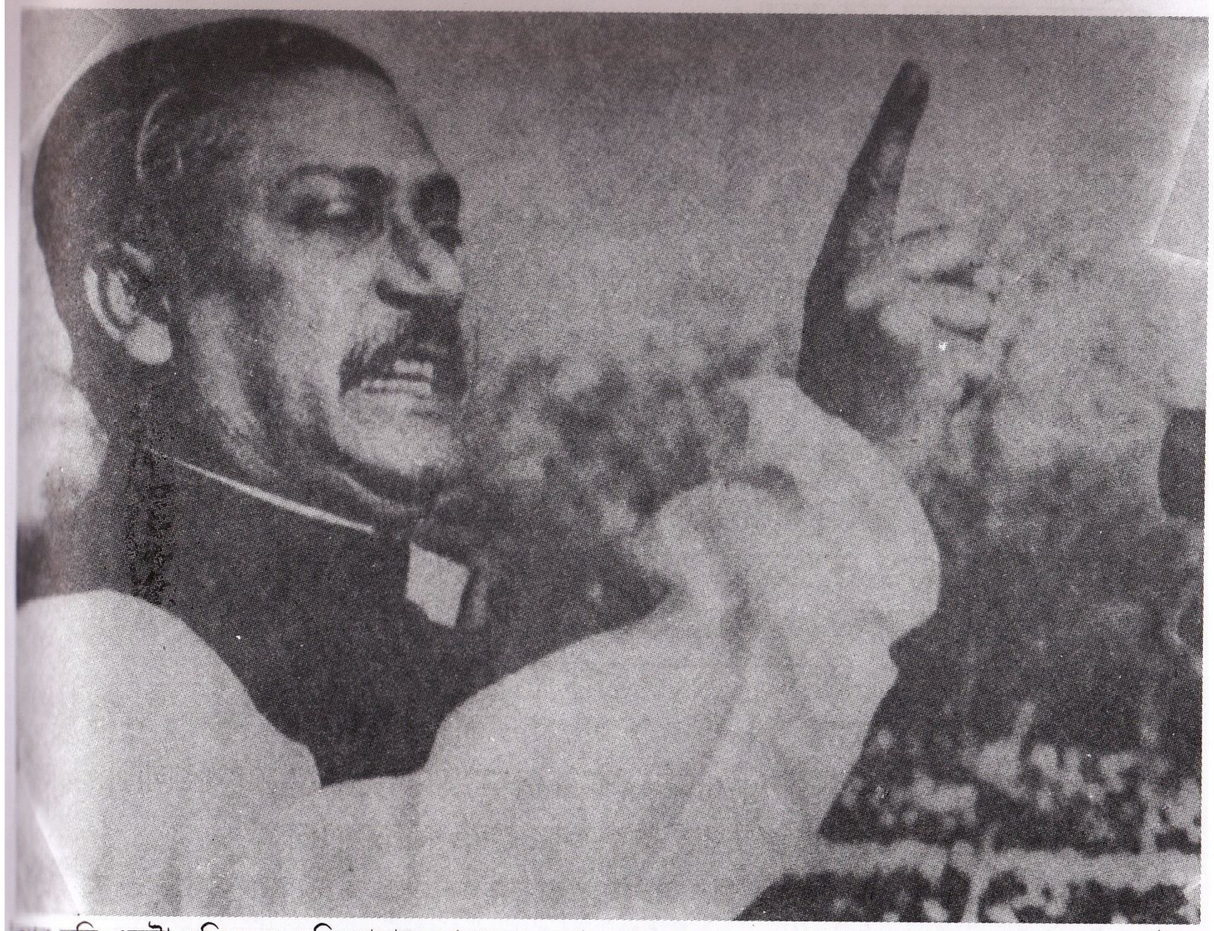
তাৎক্ষণিকভাবে ইট, বালু, সিমেন্ট সংগ্রহ করে সে রাতেই তৈরী করা হলো শহীদ মিনার। ২৩শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন উদ্বোধন করেন শহীদদের উদ্দেশ্য সেই স্মৃতিস্তম্ভটি।

তাও মেনে নিতে পারেনি বর্বর পশ্চিমারা। ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাতের অন্ধকারে পুলিশ ভেঙ্গে ফেলে সেই প্রথম শহীদ মিনারটি।

প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সমস্ত জাতি। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক হাতে তুলে নিল কলম। চির বিদ্রোহী ভঙ্গিতে লিখতে শুরু করলো হৃদয়ের রক্ত ঢেলে।

ভাষার জন্য, অক্ষরের জন্য কত তাজা প্রাণ নৃশংসভাবে কেড়ে নিল পাকিস্তান সরকার। শুধু মাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষ হত্যার মতো জঘন্য কাজ করে ওরা।

প্রায় দু'বছর অন্ধকার কারাবাসের পর ২৫শে মার্চে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিবুর রহমান।



আর যদি একটা গুলি চলে, যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল- প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'



পুঞ্জিভূত মেঘে তাড়িত বায়ুর মতো সম্মুখে এগিয়ে চলা

সময়টি ছিল আঁধারেতে ঢাকা। বাঙলার নেতৃত্বস্থানীয় যে ক'জন ছিলেন তার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। কোন কিছুতেই যেন আপোষ করতে জানতেন না তিনি। ক্ষমতার লোভ বা ভয় ছিল না তার। জুলুম, নির্যাতন সয়েছে কিন্তু আপোষ করেনি কখনো। পশ্চিমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন সব সময়।

সম্মুখে জমে থাকা সকল পুঞ্জিভুত মেঘ পাগলা বায়ুর মতো তাড়িয়ে, আঁধার মুক্ত চকচকে সোনা রোদ বাঙলার আকাশে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি।

আর এই কারণেই পশ্চিমা শোষক গোষ্ঠির চক্রান্তের স্বীকার তাকে হতে হয়েছিল বার-বার। সংসার ফেলে দীর্ঘদিন কারাবাস করতে হয়েছে তাঁর। কখনোই সংসারের কথা ভাবেননি শেখ মুজিবুর রহমান। পুরো বাঙলাটাই ছিল তার প্রাণে।

এ দেশের মানুষের দাবী আদায় করতে গিয়ে কখনোই তিনি ভাবেননি তার পরিণামের কথা। বার-বার মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি ভেবেছেন এদেশের সাধারণ মানুষের কথা। অভুক্ত মানুষের কথা। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও এক মুঠো ভাত জোটে না যাদের কপালে, তাদের কথা ভেবেই নিরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলতেন তিনি।

যখন তিনি দেখলেন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান একটি দেশ হলেও দু'টি প্রদেশের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যতার স্বীকার হচ্ছে বাঙালীরা। তখন বাঙালীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে গেছেন নিরলসভাবেই।

পৃথিবীর অনেক দেশেই বহু মানুষ আছেন, বঞ্চিত মানুষের কথা ভেবে সাম্যের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন আমরণ। কেউ মনে করতেন সশস্ত্র

বিপ্লবের মাধ্যমে শোষকগোষ্ঠীকে চিরতরে নির্মূল করা সম্ভব। তাই অনেকেই বেছে নিয়েছেন সশস্ত্র বিপ্লবের পথ।

কিন্তু কেউ আবার মনে করেন দীর্ঘ ও স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন কোন ব্যক্তি বা গণ হত্যা করে সম্ভব নয়। তাই সুবিধা বাদি বুর্জোয়া, ক্যাপিটালিষ্টদের হাত থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে কাজ করতে হবে কৃষক শ্রমিক ও সর্বহারাদের নিয়ে।

যারা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত তাদের এগিয়ে আসতে হবে সমাজ গঠনে। তাহলেই সমাজে মানুষ ফিরে পাবে তাদের অধিকার। কাল মার্কসের মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্যের জন্য সারা জীবন কাজ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সাম্য প্রতিষ্ঠান করে গেছেন তিনি।

ক্ষমতা লোভী সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লেনিন। তার লেখা পুঁজিতন্ত্রের উপর বই বিশ্বে সমাদৃত।

যে মানুষটি বঙ্গের সাথে মিশে যেতে পেরেছে। সেই ভুষীত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু উপাধিতে। যিনি কাজ করতে ভালবাসতেন কৃষক শ্রমিক সাধারণ মানুষদের নিয়ে। তাইতো সারাজীবন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পিছনে ছুটেছেন তিনি। কারণ একমাত্র সুস্থ্য গণতন্ত্রেই মানুষকে ফিরিয়ে দিতে পারে তার অধিকার। কথা বলার অধিকার, মৌলিক অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার।

৫২-র ভাষার দাবীতে বুকের রক্ত দিয়েছে বাঙলার তরুণ তাজা প্রাণ। জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছে বহু মানুষকে। সেই সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করা হলো শহীদ দিবস।

তার পর উচ্চারিত হলো শত-সহস্র কণ্ঠে, 'শহীদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না,'রাষ্ট্রভাষা বাঙলা চাই' সেদিন মিছিলে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নেতৃত্বেই মিছিল শেষে শুরু হলো আলোচনা সভা। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানসহ বক্তব্য রাখলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের এবং অন্য সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা। রাষ্ট্রভাষা বাঙলার দাবীতে সকলকে এক হয়ে আন্দোলন করার আহবান জানালেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫৩ সালের ৯ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল শুরু হলো। সেই কাউন্সিলে কাউন্সিলারদের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন শেখ

মুজিবুর রহমান। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করলেন তিনি।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন শুরু। সেই নির্বাচনে পশ্চিমাদের দোসরদের হাত থেকে বাঙলার মানুষকে মুক্তি দিতেই হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেরে বাঙলা ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করা হলো নির্বাচনী ঐক্যজোট-যুক্তফ্রন্ট।

শুরু হলো নির্বাচনী প্রচারণা। তখন বাঙলার প্রত্যেকটি গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে বেরিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙলার প্রতিটি মানুষকে বোঝাতে চেয়েছে দুই পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান।

পশ্চিমা গোষ্ঠিরা কখনোই মেনে নিতে পারে না বাঙালীর ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। দিতে জানেনা ন্যায্য অধিকার। তাই বাঙালীর অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে বাঙালীদেরই। যত দিন বাঙালী তার অধিকার ছিনিয়ে আনতে না পারবে ততদিন এভাবে নির্যাতন সহ্য করতে হবে বাঙালীদের।

পশ্চিমারা পূর্ব-বঙ্গের লোকেদের ভাবে গোলাম। তার কখনোই এক দেশের মানুষ ভাবে না। সেটা তাদের কর্মকান্ডেই বলে দেয়। এই সব নিয়েই চলল বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী প্রচারণ।

সেই নির্বাচনে বাঙলায় গণজোয়ার উঠলো যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে। বাঙলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলো ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে।

বাঙালীর চাওয়া প্রতিফলিত হয়েছিল ৫৪-এর সাধারণ নির্বাচনে। পূর্ব-বঙ্গ পশ্চিমাদের দোসরদের ভরাডুবি হলো নির্বাচনে। পূর্ব-পাকিস্তানে মোট ৩১০টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেলো মাত্র ৯টি আসন। বাকি সবগুলো আসন পেল যুক্তফ্রন্ট।

নিরঙ্কুশ বিজয় হলো বাঙলার মানুষের। এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠন করা হলো যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা। বিপুল ভোটের ব্যবধানে পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হলেন এ কে ফজলুল হক। যুক্তফ্রন্ট গঠিত সরকার কাজ করতে লাগলো বাঙলার উন্নয়নে। মানুষের অধিকারের কথা ভেবে।

কিন্তু অগণতান্ত্রিক পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় সরকার কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারলো না যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা। আবার শুরু হলো চক্রান্ত। বাঙলার মানুষের বিরুদ্ধে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলো যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার

উপর। তাই পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কুচক্রের কারণে মাত্র দু'মাসের মাথায় ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হলো পূর্ব-পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা।

পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হলো ইস্কান্দার মির্জা। এবং জারি করা হলো গভর্ণর শাসন ব্যবস্থা। এতে সমস্ত ক্ষমতা চলে গেলো ইস্কান্দর মির্জার হাতে। এই ঘটনায় দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল পূর্ববঙ্গ জুড়ে। শুরু হলো আন্দোলন।

কিন্তু পশ্চিমা শাসকেরা শুরু থেকেই ছিল গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ক্ষমতার লোভ, দুর্বল এবং সাধারণ মানুষকে শোষণ করাই ছিল তাদের রক্তে। ১৯৫৪ সালের ১৪ই অক্টোবর পাকিস্তানের গণ পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলো সারাদেশে।

এই সকল চক্রান্ত কিছুতেই মানতে পারেনি শেখ মুজিবুর রহমান। সেই জরুরী অবস্থার মধ্যেই আওয়ামী মুসলিম লীগের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে তোলা হলো আন্দোলন।

কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে মোহাম্মাদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠন করা হয় নতুন মন্ত্রীসভা। সেই মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী হিসেবে গণ পরিষদে যোগ দেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। এবং এ কে ফজলুল হক হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তার কিছুদিন পর পদত্যাগ করলেন মোহাম্মাদ আলী। তখন প্রধানমন্ত্রী হলেন চোধুরী মোহাম্মাদ আলী।

১৯৫৫ সাল। তখনো রাষ্ট্রভাষা বাঙলা পায়নি কোন মর্যাদা। সে বছর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, জগন্নাথ কলেজ সহ ঢাকার প্রায় সব ক'টি কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীর বিশাল অংশগ্রহণে পালন করা হলো এই শহীদ দিবস। বাঙালীর প্রাণের দাবী যত দিন পর্যন্ত পালন না হবে ততদিন পর্যন্ত চলবে আন্দোলন।

কিন্তু পাকিস্তানী শোষকেরা কিছুতেই যেন পালন করতে দেবে না একুশে ফেব্রুয়ারী। সেদিন জারি করা হলো ১৪৪ ধারা। কিন্তু ছাত্রদের এক কথা। ১৪৪ ধারা তার ভাঙ্গবেই। তাই ১৪৪ ধারা ভেঙ্গেই পালন করা হলো শহীদ দিবস। সেদিন গ্রেফতার করা হলো অগণিত ছাত্রনেতাসহ সাধারণ ছাত্রদের।

ছাত্র গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী মুসলিম লীগের পক্ষে থেকে দেয়া হলো কঠিন কর্মসূচি। বঙ্গবন্ধু তার কর্মসূচিতে ঘোষণা করলেন, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি না দিলে আন্দোলন চলবে।

১৯৫৫ সালে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলো পাকিস্তানকে। তখন পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন ইস্কান্দার মির্জা। সেই বছর ৮ই সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহম্মাদ আলী।

তৎকালিন প্রেসিডেন্টের রিপাবলিকান দলের সমর্থনে ১৯৫৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তার নেতৃত্বে চলতে লাগলো পাকিস্তানের মন্ত্রীসভা।

তখন রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পেলো বাঙলা ভাষা। পুরণ হলো বাঙ্গালীর প্রাণের দাবী। বহু রক্ত ঝরে, নির্যাতন সহে এলো ভাষা অধিকার। শহীদদের রক্ত বৃথা যায় না।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে নিয়েই প্রস্তুত হতে লাগলেন নির্বাচনের। সারাদেশব্যাপী চলতে লাগলো নির্বাচনী প্রস্তুতি। গণতন্ত্রের পক্ষে পূর্ববঙ্গের মানুষ কাজ করে গেছেন তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের শক্তি বাড়াতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন বাঙলার প্রতিটি জনপথে।

অবশ্য ততদিনে বাঙলার মানুষের প্রাণের দল হয়ে উঠেছে আওয়ামী লীগ। আর শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাঙলার মানুষের প্রিয়পাত্র। এই দলের মধ্য দিয়ে বাঙলার মানুষ পেতে চেয়েছে তাদের অধিকার। তাদের দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের প্লাটফর্ম।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙলার কণ্ঠ হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে তুলে ধরেছেন বাঙালীর দুঃখ দুর্দশার কথা। অন্নহীন, বস্ত্রহীন বাঙলার মানুষের কষ্টের কথা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তার প্রতিটি কর্মে।

বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তবুও বাঙলার প্রতি বন্ধ হলো না শোষণ নির্যাতন। কিভাবে বাঙলার মানুষকে শোষণ করা যায়, দাবিয়ে রাখা যায় এটাই ছিল পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে মানুষকে শোষণ করাই ছিল পশ্চিমাদের কাজ।

কখনোই গণতন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের কথা ভাবেনি তারা। পশ্চিমারা ক্ষমতা দখল করতেন শুধুমাত্র পেশী শক্তির জোরে। সেই বর্বর যুগের

লিওনদারথের মানুষদের মতো। এই মানষিকতা পশ্চিমাদের আরো বেশি দক্ষলদার করে তুলেছিল।

ভালই চলছিল নির্বাচনী প্রচারণা। শুধু পূর্ব-পাকিস্তান নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বইছিল একটি সু-বাতাস। স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র সকলেরই কাম্য।

কিন্তু সাধারণ মানুষের সেই হৃদয়ের দাবী পূরণ হলো না। পশ্চিমাদের চক্রান্তে অল্প কদিনেই প্রধানমন্ত্রীত্ব হারাতে হলো সোহ্‌রাওয়ার্দীকে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা ভয় পেতেন গণতন্ত্রে। তারা নির্বাচন পছন্দ করতেন না। তাই যে কোনভাবেই হোক বানচাল করে দিতেন নির্বাচন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তে বিক্ষোভে ফেটে পড়লো সারা দেশ। বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ নেমে এলে রাজপথে। বাঙলার মানুষের প্রতি এই অবিচার প্রতিবাদের ঝড় উঠলো সারাদেশে।

তখন থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতিকে এক করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিল এভাবে চলতে পারে না। পশ্চিমাদের খেয়াল খুশি মতো চলতে হয় পূর্ব-বঙ্গের লোকদের। এটা কোন স্বাধীন দেশের ধারা হতে পারে না।

তখনই আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে তিনদিনব্যাপী ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হলো 'কাগমারি' সম্মেলন। মূলত সেই সম্মেলনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়েছিল বাঙলার মানুষ।

এই সাথে যোগ দিলেন পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাকিস্তান এবং ভারত থেকে আসা বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাদের সকলের উপস্থিতিতে বঙ্গের নেতা তুলে ধরলো এদেশের বিভিন্ন সমস্যা।

এই সম্মেলনের মূল দাবী ছিল, পূর্ব-বঙ্গের পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন, গণবিরোধী সামরিক চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি।

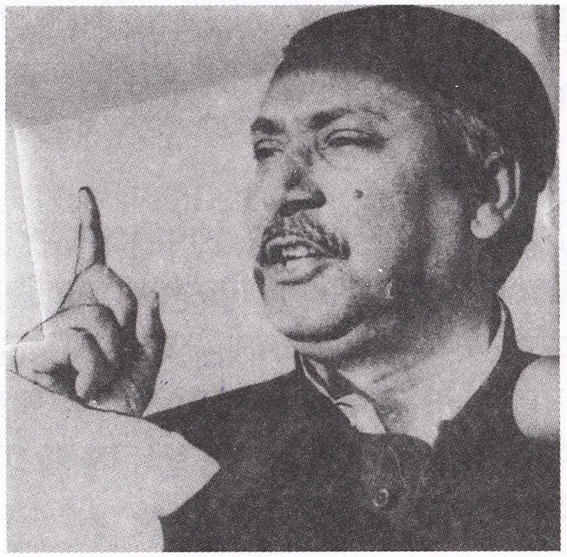
সেদিন আওয়ামী লীগের মাওলানা ভাসানী তাঁর অগ্নিঝরা কণ্ঠে বলেছিলেন, এই দাবী মানা না হলে ভবিষ্যতে হয়তো আজ থেকে দশ বছর পরে এমন এক সময় আসতে পারে, যখন পূর্ব বাঙলা পশ্চিম পাকিস্তানকে আচ্ছালামু আলাইকুম বলবে।

সেই সম্মেলনের পর থেকেই বাঙলার দাবী আদায়ে আন্দোলন শুরু করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি তার সু-প্রসারী সুক্ষ ভাবনায় হয়তো ভেবেছিলেন পশ্চিমাদের সাথে এক সাথে থাকার আর পরাধীনতা মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তখন থেকেই তিনি তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পুরো জাতিকে এক করে এগিয়ে চলছিলেন সামনের দিকে। কাগমারি সম্মেলনের দাবী না মানা হলে আন্দোলন চলবে। মুত্যুকে ভয় পাওয়ার মতো কাপুরুষ বাঙ্গালী মায়ের গর্ভে জন্মে নেয় না।

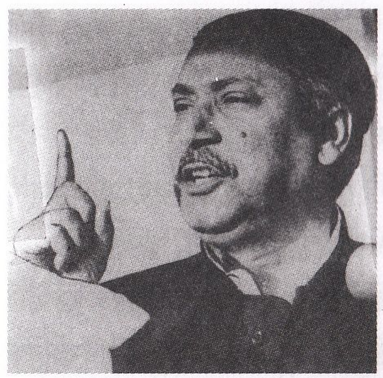
মূলত কাগমারি সম্মেলনের এবং দাবী আদায়ের আন্দোলনে পাকিস্তান কেন্দ্রিয় সরকারে মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ভিতরে-ভিতরে তাদের চক্রান্ত আরো বেশি দৃঢ় হলো। যে করেই হোক বাঙালী জাতিকে এখন থেকেই বিচ্ছিন্ন করে না রাখতে পারলে ভবিষ্যৎ-এ পাকিস্তানের নেতৃত্ব হয়তো তাদের হাতে চলে যাবে।

হয়তো তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন দল গঠন করলেন মাওলানা ভাসানী। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন করে তিনি গঠন করলেন, 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)'।

এতে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব সহ অন্য সকল নেতা কর্মীরা ক্ষুব্ধ হলেন মাওলানা ভাসানীর উপর। তখন শেখ মুজিবুর রহমান বাধ্য হয়েই ভাসানীর সঙ্গ ত্যাগ করে অনুগত হলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর। এবং আওয়ামী লীগের হাল ধরলেন শক্ত হাতে।



সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন বঙ্গবন্ধু



ছয় দফা

জোর যার মুল্লুক তার। জোর যার সেই পাকিস্তানের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই নীতিই ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকে পাকিস্তানে। গণতন্ত্রের তোয়াক্কা কখনোই করেনি পাকিস্তান শোষকগোষ্ঠি।

পশ্চিমাদের চক্রান্তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হারালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব। তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব হারাবার পর মাত্র অল্প কদিনের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন, ইসমাইল ইব্রাহীম চুন্দ্রিগড়। তার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন, ফিরোজ খান নুন।

এরই ফলশ্রুতিতে পুরো পাকিস্তান জুড়ে দেখা দিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। মানুষের মধ্যে দেখা দিল গভীর অসন্তোষ। কিন্তু ষড়যন্ত্র বন্ধ হলো না পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার। এই রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পুঁজি করে ১৯৫৮ সালের ৮ই অক্টোবর পুরো পাকিস্তানে জারি করা হলো সামরিক আইন। এবং জেনারেল আইউব খান হলেন সামরিক আইন প্রশাসক।

মাত্র অল্প কিছু দিনের মধ্যে পাকিস্তানের মসনদে বসার নীলনকশা করে নিলেন জেনারেল আইউব খান। ২৭শে আক্টবর প্রেসিডেন্টের পদ দখল করে নিলেন তিনি। ইস্কান্দার মির্জাকে বাধ্য করা হলো পদত্যাগ করতে।

এই সব অগণতান্ত্রিক এবং গণবিরোধী কাজের বিরোধীতায় বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পূর্ব-বঙ্গের মানুষ। রাজ পথে আন্দোলন শুরু করলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

শুরু হলো সামরিক সরকারের নির্যাতন। ১৯৫৮ সালে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হলো শেখ মুজিবুর রহমানকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের আন্দোলনের মুখে জেল থেকে শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন সামরিক সরকার আইউব খান।

কিন্তু গণতন্ত্র হত্যাকারীদের চক্রান্তের কোন শেষ নেই। শেখ মুজিব মুক্তি পাবার ক'দিনের মাথায় আবারও গ্রেফতার করা হলো তাকে। বাঙলার মানুষ আবার শুরু করলো আন্দোলন। সুস্থ্য গণতন্ত্রের জন্য বহু আন্দোলন সংগ্রামের এবং নির্যাতন সহ্য করতে হলো বাঙলার মানুষদের।

এখানে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে কিছু কথা বলেতে হয় ভারত সম্বন্ধে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন, জওহরলাল নেহেরু। যখন পাকিস্তানে পেশী শক্তির আর ক্ষমতার মোহে অন্ধ। তখন পাশের দেশ ভারতে পূর্ণ গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যস্ত। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তারা কাজ করতে লাগলেন নিরলসভাবে।

এত বিশাল একটি রাষ্ট্রকে একত্রে রাখার জন্য সমস্ত সুখ ত্যাগ করে দিনে প্রায় ১৮ ঘন্টা কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। দেশের এক মাথা থেকে অন্য মাথা ঘুরে বেড়াতেন তিনি। বহু জাতিক এই দেশটাকে একত্রে রাখার জন্য, এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে গিয়ে তার দুঃখ দুর্দশা ভাগ করে নিতেন তিনি।

এই বহু জাতিক ভারত হাজারো সমস্যা নিয়ে যখন চলছে সুস্থ্য গণতন্ত্র চর্চার দিকে। তখন ক্ষমতা লোভী পশ্চিমা সামরিকজান্তারা খুবই নগ্নভাবে ক্ষমতা দখল করে যাচ্ছে পাকিস্তানের। অথচ দু'টি দেশ স্বাধীন হয়েছিল একই সাথে।

১৯৬৪ সালে জওহরলাল নেহেরুর মুত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে পুরো ভারত জুড়ে। যে লোকটি স্বাধীনতার পর ক্ষত-বিক্ষত একটি দেশকে শক্ত হাতে টেনে তুলে নিয়ে এলো এতদূর তার মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়লো পুরো দেশের মানুষ। তার অভাব পূরণ করবে কে ? এবার বুঝি দেশটা গেলো, গণতন্ত্র গেলো।

এরই মধ্যে পুরো ভারত জুড়ে ঝড় উঠলো কে হবে কংগ্রেসের সভাপতি। অনেকেই বলছে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। অনেকেই বলল, ইন্দিরা গান্ধি। কিন্তু তখনো ইন্দ্রিরা গান্ধির বয়স কম। এই অল্প বয়সে এত বড় একটি দেশ চালাতে পারবে? এই নিয়ে দেখা দিল বিরাট সংশয়।

সেই সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইন্দিরা গান্ধিই হলেন কংগ্রেসের সভাপতি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শপথ গ্রহণ করেই দেশের কাজে নেমে পড়লেন তিনি। এই সুক্ষ্ম চিন্তাশীল মহিলা তার ধৈর্য্য আর

সাহসিকতা দিয়ে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে চললেন নতুন এক পথে। তার কাজে দেশের মানুষ অল্পকিছু দিনেই বুঝে নিল ইন্দিরা গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অযোগ্য নয়। তিনিই যোগ্য যার হাতে ভারতের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্ব থাকবে অটুট।

পাকিস্তানের সামরিক সরকারের নির্যাতন আর পূর্ববঙ্গের উপর বিভিন্ন প্রকার কু-আইনের প্রেক্ষিতে আন্দোলন চলতে থাকলো পূর্ব পাকিস্তানে। সেই আন্দোলন এতই তীব্র ও ভয়াবহ রূপ নিল যে লাহোর গোল টেবিল বৈঠকের জন্য শেখ মুজিবকে আহ্বান জানালেন পশ্চিমারা।

বাঙলার মানুষের মুখপাত্র হয়ে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গোল টেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য ঢাকা ত্যাগ করেন শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতিতে শুরু হলো গোল টেবিল বৈঠক। সেখানে বাঙলার মানুষের পক্ষে ৬ ছফা পেশ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সেই ছয় দফা হলো-

১) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্রে রূপ দিতে হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতি এবং আইন সভায় সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২) দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকবে কেন্দ্রের হাতে, অন্য সকল বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারিন্সি থাকবে। তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি মুদ্রার সহজ প্রচলন থাকবে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে একটি। এবং দু'টি অঞ্চলের জন্য দু'টি পৃথক ব্যাংক থাকবে।

৪) সকল প্রকার খাজনা ট্যাক্স কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

৫) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক-পৃথক হিসেব রাখা হবে।

৬) পূর্ব-পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী গঠন করা ও রাখার অধিকার থাকবে।

শেখ মুজিবের ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্ত্বশাসন দিলে পাকিস্তান দুর্বল হবে না। বরং ধীরে-ধীরে শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে সুস্থ গণতন্ত্রে। এই সহজ সত্যি কথা বুঝলো সকলেই কিন্তু মানতে রাজী হলো না পশ্চিমা শোষকেরা।

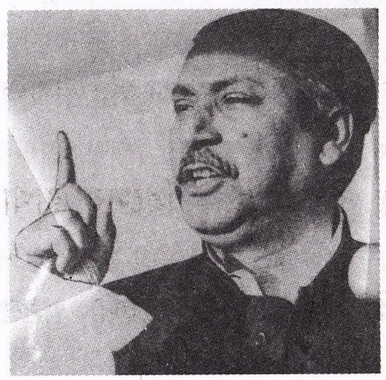
এই ছয় দফায় বাঙলার জাতীয়তাবাদে যোগ হলো একটি নতুন মাত্রা। এই ছয় দফা ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্ত্ব শাসনের অধিকারের দাবী। এতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠি আতংকিত হয়ে পড়লো।

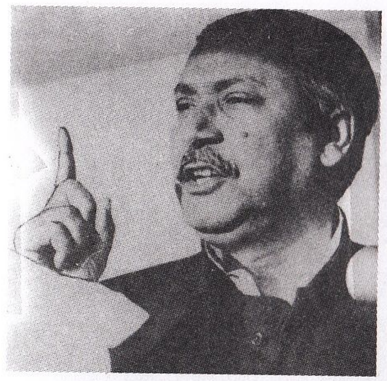
তাই ছয় দফার প্রতি কোন রকম আগ্রহ না দেখিয়ে, বাঙলার বিরুদ্ধে আবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো সামরিক সরকার আইউব খান। শক্তিশালী হবে পূর্ব পাকিস্তান। তাই ছয় দফা না মেনে আরো বেশি ক্ষুব্ধ হলো শেখ মুজিবুরের উপর।

কি ভাবে মুজিব সহ পূর্ব-পাকিস্তানের লোকদের দাবিয়ে রাখা যায়, তা নিয়ে শুরু গভীর চক্রান্ত। কোন রকম ফাক-ফোকর না পেয়ে মুজিবকে বলা হলো ভারতের দালাল।

এর আগে ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর নিজের হাতে আওয়ামীলীগ পুনর্গঠন করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ৬৬ সালে ফজলুল হকের এবং মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে দেয়া হলো দেশদ্রোহীর মামলা।

আর ভারতের দালাল বলে মিথ্যে অপবাদে দেশদ্রোহীর অভিযোগ এনে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দেয়া হলো, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। কত নগ্নভাবে পশ্চিমা সামরিক সরকার নেমেছিল শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে। বাঙলার বিরুদ্ধে। তারা ভেবেছিল বাঙলার নয়নের মনি শেখ মুজিবকে চির তরে স্তব্ধ করতে পারলেই বন্ধ হবে বাঙলার মানুষের সকল দাবী।





'৬৯-এ গণঅভ্যুত্থান

বাঙলার মুখ চির তরে বন্ধ করে দেওয়ার সেই আশা কখনোই পূর্ণ হলো না পশ্চিমাদের। বাঙলার মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে না। অধিকার আদায়ে, সত্য এবং সুস্থ গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত নয় বাঙলার মানুষ।

যে জাতি মায়ের মুখের ভাষার জন্য প্রাণ দিতে জানে বিনা দ্বিধায়। সে জাতিকে অন্যায় ভাবে দাবিয়ে রাখা যায় না। এই দৃঢ় সত্য কথাটা বুঝতে পারে নি নির্বোধ, স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী, বর্বর, সাম্রাজ্যবাদী, আগ্রাসী, নির্যাতন প্রিয়, লুণ্ঠনকারী, মনে পশুজাগ্রত পশ্চিমা শোষকেরা।

৬৮ সালের ৮ই মে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী করে দেশদ্রোহের অপরাধ এনে গ্রেফতার করা হলো শেখ মুজিবুর রহমানকে। মুজিবের এই গ্রেফতারে পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে উঠলো আন্দোলনের ঝড়। বাঙলার উপরে আবার শুরু হলো অগণতান্ত্রিক সামরিক পাকিস্তান সরকারের অমানবিক নির্যাতন। সামরিক আইউব সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও আরো দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার লোভে অন্ধ হয়ে উঠল। তাই সামরিক শাসনেই দেশ চালাতে লাগলো সে।

কিন্তু বাঙলার মানুষের আন্দোলনের মুখে যখন আইউব খানের সিংহাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল তখন তিনি বেছে নিলেন অন্য পথ। সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, 'আগরতলা' মামলার ধারা বিবরণী।

তারা সেখানে তুলে ধরতে চেয়েছিল মুজিবের ভারতপ্রিয়তা। পূর্ব বাঙলার বাঙালী মুসলমানদেরই ভারত বিরোধী মনোভাবকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙলার মানুষ কখনোই নির্বোধ, বর্বর ছিলেন না।

আইউব খান ভেবেছিল, যদি মানুষকে বোঝানো যায় শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের দালাল। অখন্ড মুসলিম রাষ্ট্র পকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের

হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তখন বাঙালী মুসলমানরা মুজিবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে আসবে।

কিন্তু হলো তার সম্পূর্ণ উল্টো। মামলার ধারা বিবরণী প্রকাশে পর পূর্ব-বাঙলার মানুষ স্পষ্টভাবে বুঝে নিল এটা আইউবের ঘৃণ্য চক্রান্ত। এই ঘৃণ্য চক্রান্তমূলক মামলা শুধু মুজিবের বিরুদ্ধেই নয়, বাঙালীরা বুঝলো এটা পুরো জাতির বিরুদ্ধে। তাই বাঙলার মানুষ রুদ্র-রূপে ফেটে পড়লো অগণতান্ত্রিক আইউব সরকারের বিরুদ্ধে।

এরই মধ্যে এই সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতিয় সংগ্রামে রূপ দেবার লক্ষ্যে ১১ দফার ভিত্তিতে গঠন করা হলো, 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।' ১১ দফার ভিত্তিতে এবং এই সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শুরু হলো আন্দোলন।



স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্টানে সহকর্মীদের সাথে বঙ্গবন্ধু



ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবী

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। শাসন-শোষণ নিপীড়নে অতিষ্ট ছাত্র-জনতা আন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন। আমারা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফা দাবীতে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি।

স্বচ্ছল কলেজসমুহকে প্রাদেশিকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ। এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদানকরতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ ভারী শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

কৃষকদের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মনপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ ও আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জন সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করিত হইবে।

সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

এই ১১ দফার ভিত্তিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শুরু হলো ছাত্র আন্দোলন। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী পুলিশের গুলিতে নিহত হলো ছাত্র নেতা আসাদ। আসাদের রক্তে আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠলো আন্দোলন। সারা পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো মুহূর্তেই।

আর কতবার বাঙলার বুক ভাসবে বাঙালীর রক্তে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারারুদ্ধ। আসাদের মৃত্যু আর দেশের উপর এই শোষণে বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন তিনি।

এদিকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রামের নেতৃত্বে ১১দফা দাবী আদায়ে চলছে জোর আন্দোলন। বাঙলার প্রতিটি জেলায়-জেলায় মানুষ নেমে এলো রাজপথে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, মিল-কল কারখানায় ধর্মঘট।

ধীরে-ধীরে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন বাঙলার সর্ব শ্রেণীর মানুষ। এই আন্দোলন বন্ধ করতে ঘৃণ্য এক চক্রান্তে মেতে উঠলো আইউব খান। তার প্রতিবাদে বাঙলার মানুষ যখন এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আন্দোলনে। তখন তা রূপ নিল গণঅভ্যুত্থানে।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাঙলার মানুষের চাওয়া, আকুতি ও প্রাণে জমে থাকা সব অব্যক্ত প্রকাশ পেতে থাকে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বাঙলার মানুষ যেন স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। অধিকার আদায়ের দাবীতে মরতে ভয় নেই তাদের। পূর্ব-বঙ্গের মানুষের এই আন্দোলনের মুখে পুরো অচল হয়ে পড়লো সামরিক আইউব সরকার।

Northern University * Bangladesh * NUB Library

এই গণআন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হলো সামরিক সরকার। শুধু তাই নয় মুজিবের দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো আইউব খান।

মুজিবের এই নিঃশর্ত মুক্তিতে বাঙলার মানুষের হলো বিশাল জয়। নতুন দিকে, নতুন পথে এগিয়ে চলতে লাগলো বাঙলার মানুষ। সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তান, বাঙলার মানুষকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল নতুন কোন পথে।

শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পাবার পর সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হলো বিপুল সংবর্ধনা। ১৯৬৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারী পল্টনে এক মহা সমাবেশের মধ্যদিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে।

তখনো শেষ হয়নি আইউব বিরোধী আন্দোলন। কোন নির্বাচন ছাড়াই গণতন্ত্রের হত্যাকারী সামরিক সরকার আইউব খান দীর্ঘদিন দখল করে রেখেছে পাকিস্তানের ক্ষমতা। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে স্বাধীন পাকিস্তানের মানুষ।

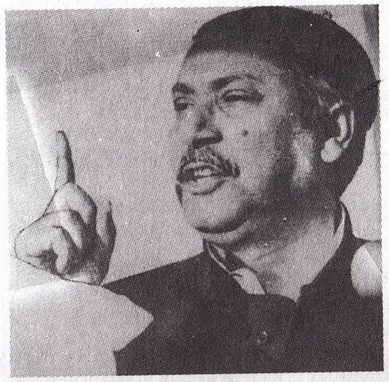
বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ তাদের অধিকার পায়নি কিছুই। বরং বিভিন্ন সময় জেল জুলুমের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের। তাই স্বৈরাচার আইউব সরকারে পতনের ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শুরু হলো রাজপথে আন্দোলন।

সেই গণআন্দোলনের মুখে রাষ্ট্র চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ল আইউব খানের। শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে ১৯৬৯ সালে ১৫ই মার্চে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন আইউব খান।

কিন্তু সেই একইদিন আবার সামরিক আইন জারি করে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট হয়ে সকল ক্ষমতা দখল করে নিল জেনারেল ইয়াহিয়া খান। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েই শুরু হলো তার অত্যাচার।

ক্ষমতায় এসে সামরিক আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে লাগলো ইয়াহিয়া খান। মানুষ যে দিশেহারা। বাঘের মুখ থকে এসে পড়লো সিংহের খাচায়। গণতন্ত্রের জন্য সব আন্দোলন যে বৃথা যেতে চলছে। গণতন্ত্রের কথা যেন বুঝতেই চায় না সামরিক সরকার। বরং শোষণ নির্যাতন বেড়ে চলছে দিনে-দিনে।

A-98525



'৭০-এ সাজানো নির্বাচন

সেই পলাশীর প্রান্তরে বাঙলার শেষ নবাব, নবাব সিরাজদৌল্লার অনাকাক্ষিত পরাজয়ের পর পুরো ভারতের ক্ষমতা চলে গেলো আগ্রাসী ইংরেজদের হাতে। প্রায় দু'শ বছর চলে তাদের আগ্রাসী কর্মকান্ড। বিভিন্ন শোষণ নির্যাতনের মধ্যে ইংরেজদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকে এদেশের মানুষ। তখন নীল চাষ হতে শুরু করে বাঙলার কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষকে বাধ্য করা হতো ইংরেজ স্বার্থের বিভিন্ন কাজে। এতে কখনো-কখনো দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতো দারুণভাবে। দারিদ্রের যাতাকলে নিঃশ্বেস হতো এদেশের কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ। ক্ষুধার জ্বালা আর নিজের দেশেই দাসত্বের কষ্ট বুকে নিয়ে কখনো কান্না আবার কখনো ফেটে পড়তো বিদ্রোহে। জীবন যাবে যাক। তুবও শত্রু মুক্ত করতে হবে মাতৃভূমিকে।

মানুষের এই অমানষিক দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা দেখে বাঙলার মানুষ বসে থাকতে পারেনি। এই বাঙলার বুকেই সর্বপ্রথম গঠন করা হলো স্বদেশী বিপ্লবী সংগঠন। কখনোই অন্যায় সহ্য করে মুখ বুঝে বসে থাকে নি বাঙলার মানুষ। জীবন দিয়ে হলেও প্রতিকার করার চেষ্টা করেছে তারা। এবং সফলও হয়েছে। বাঙলার মায়েদের গর্ভে যে বীরদের জন্ম তাদের মাথা নত হয়নি কোন কালেই। নজরুলের উন্নত শির হয়েই চলেছে সামনের দিকে।

কোন প্রলোভন বা জুলুমের সাথে আপোষ করেনি বাঙলার মানুষ। বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তরবারি হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে সারা জীবন। সত্যের মুখোমুখি হয়েছে ক্ষুদিরাম বসু হতে শুরু করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পর্যন্ত।

১৯৬৯-এর ২৫শে মার্চে আইউবের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। প্রেসিডেন্ট হয়েই ক্ষমতায় থেকে সামরিক শাসন চালানোর জন্য শুরু হলো নতুন চক্রান্ত। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নেশায় উন্মাদ হলেন তিনি। ক্ষমতা তার চাইই চাই। এতে বাঙলার মানুষ যদি সব মেরে ফেলতেও হয়, তাতেও প্রস্তুত ইয়াহিয়া খান।

শুরু হলো ইয়াহিয়ার অমানুষিক নির্যাতন। সেই নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে শুরু হলো আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন কর্মসুচির মাধ্যমে বাঙলার মানুষ আবার নেমে এলো রাজপথে। সমস্ত ছাত্র সংগঠন হতে শুরু করে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

বাঙলার মানুষের বিক্ষোভের মুখে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা দিতে বাধ্য হলো ইয়াহিয়া খান। কিন্তু তার মনে ছিল দুর্ভিসন্ধি। যেভাবেই হোক দাবিয়ে রাখতে হবে বাঙলার মানুষকে। আর হাতে রাখতে হবে ক্ষমতা। এই '৭০-এর নির্বাচনও ছিল তার ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি কৌশল মাত্র।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হলো সাধারণ নির্বাচনের তারিখ। সামরিক সরকার ইয়াহিয়া সমর্থিত মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান বাঙলার মানুষের।

সামরিক জান্তা ইয়াহিয়া ভেবেছিল, মুসলিম লীগের বিজয় হবে। মুসলিম লীগের বিজয় হওয়া মানেই তার বিজয়। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান হবে তিনি। তখন গণতন্ত্রের আড়ালে সামরিক নির্যাতন চালাতে আর কোন সমস্যা থাকবে না তার। তাই এই নির্বাচনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণা চলতে লাগল ৬ দফার ভিত্তিতে। বাঙলার মানুষের অধিকার, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন নিয়ে বাঙলার প্রতিটি জনপথে মুজিবের নির্বাচনী প্রচারণা।

দীর্ঘ দশ বছর আইউব আর ইয়াহিয়ার শোষণে পূর্ব-পাকিস্তান সহ পাকিস্তানের মানুষ অতিষ্ট। পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পক্ষে মানুষ যে ঘোর বিরোধী তারই প্রতিফলন ঘটেছিল ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে।

শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা ছিল বাঙলার মানুষের প্রাণের দাবী। এই ছয় দফাকেই কেন্দ্র করে পূর্ব-বঙ্গের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো নির্বাচনে। মুজিব হবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেই লক্ষ্যেই কাজ করেছে বাঙলার মানুষ। শুধু অল্পকিছু সংখ্যক পাকিস্তানের দালাল বাদে। কারণ এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ই ছিল বাঙলার মানুষের মুক্তির পথ।

১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন। এবং ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পেল ১৬৭টি আসন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল আওয়ামী লীগ।

এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেলো ২৮৮টি আসন। আওয়ামী লীগের এই অভাবনীয় বিজয় হলো বাঙলার মানুষের। বঙ্গবন্ধুকে মেনে নিয়ে তার নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে চায় পূর্ব-বঙ্গের মানুষ। আর পশ্চিমাদের শোষকদের সমর্থিত মুসলিম লীগ নিগৃহীত হলো চরমভাবে।

নিয়ম অনুযায়ী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু সামরিক শাসকেরা ক্ষমতা ছাড়তে রাজি হলো না। শেখ মুজিবের হাতে তো ক্ষমতা ছাড়লেনই না, বরং উল্টো মেতে উঠল গভীর ষড়যন্ত্রে।

আবার নতুন করে শুরু হলো আন্দোলন। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙলার মানুষ। শুরু হলো হরতাল, ধর্মঘট। জেলায়-জেলায় শুরু হলো বিক্ষোভ।

মার্চের সেই দিনগুলো ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের ভয়াল বিভীষিকাময় দিন। ক্ষমতার লোভে পাশ্চিমা শোষকগোষ্ঠি যে কতটা নগ্ন, নৃশংস হতে পারে তার বিবরণ দেয়া ভার। নিজের চোখে যারা দেখেছেন তারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন কিছুটা। তারও অন্তরালে রয়ে গেছে সহস্রগুণ অত্যাচার।

ট্যাংক নামিয়ে দেয়া হয়েছে রাস্তায়। সামরিক বাহিনীর গুলিতে মানুষ মরছে বাঙলার রাজ পথে। বাঙলার মানুষের রক্তের স্রোত বইছে বাঙলার বুকে। এই সব নির্যাতনে একটুও দ্বিধা বা অনুশোচনা নেই তাদের। তাদের চাই সিংহাসন।

রক্তের স্রোত আর লাশের গন্ধে উহু! কি বিভৎস সেই দিনগুলোতে স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো বাঙলার মানুষ। পশ্চিমাদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে মানুষ যে আজ দৃঢ়-ঐক্যবদ্ধ, তার প্রমাণ তারা দিয়েছে '৭০-এর নির্বাচনে।

১৯৭১ সালের ৩ মার্চে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হলো। কিন্তু সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তা স্থগিত করে দিল ৭১-এর ১ মার্চে। কারণ অধিবেশন ডাকা হলেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে আওয়ামী লীগ।

ইয়াহিয়ার এই বর্বরোচিত কাজের প্রতিবাদে দেশব্যাপী অসহযোগের ডাক দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। এই অসহযোগ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়লো বাঙলার সর্ব শ্রেণীর মানুষ। মার্চের ২-তারিখে পূর্ব-বঙ্গ জুড়ে চলতে থাকলো অসহযোগ।

এই অসহযোগকে কেন্দ্র করে মার্চের ২,৩ ও ৪ তারিখে ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ফরিদপুর, বরিশালের রাজপথ রাঙা হলো বাঙলার মানুষের রক্তে। পশ্চিমারা নির্বিচারে গুলি চালাতে লাগলো বিক্ষোভকারীদের উপর। আন্দোলনরত বাঙালী সন্তান লাশ হলো অধিকার আদায়ের জন্য।

পূর্ব-বঙ্গের অবস্থা এতই খারাপ হলো যে পুরো পূর্ব-বঙ্গ অচল হয়ে পড়লো অসহযোগে। বাঙ্গালীর দাবী আদায় না হলে ঘরে ফিরবে না। এই তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

পরিস্থিতি খারাপ দেখে তা সামাল দিতে না পেরে বাধ্য হয়েই ২৫শে মার্চে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আহ্বান জানালেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। সেটিও ছিল বঙ্গবন্ধু ও বাঙলার বিরুদ্ধে তার একটি বড় চক্রান্ত। কিন্তু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রে। তিনি ভাবতেন বাঙলার মানুষের কথা। কি করে মুক্তি পাবে বাঙলার মানুষ। পশ্চিমাদের হাত থেকে কি করে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করা যায়, তার জন্য কাজ করে গেছেন সব সময়। কোন কিছুতেই আপোষ করেনি তিনি। আপোষহীন থেকেছেন বর্বর পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে।

তাই ইয়াহিয়ার আহ্বানে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্য ৪-দফা শর্ত আরোপ করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। শর্তগুলো হচ্ছে, সামরিক আইন (মার্শাল-ল) তুলে নিতে হবে।

সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

যে সকল বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে।



স্বাধীনতার ডাক

৭ই মার্চে রেডক্রস ময়দানে ডাক দেয়া হলো বিশাল জনসভার। সেখানে ভাষণ দেবেন বঙ্গবন্ধু। সেটি ছিল বাঙালী জাতির জন্য স্মরণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। যা মনে প্রাণে মেনেও নিয়েছিল বাঙলার মানুষ। পূর্ব-বঙ্গের প্রায় ৯৮ ভাগ মানুষ সমর্থন দিয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে।

তার প্রমাণ ৭০ এর নির্বাচনে যেমনি মানুষ দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে রেডক্রস ময়দানে। শুধু ঢাকা শহরই নয় পূর্ব-বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে মিছিল আর মিছিলে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ হয়েছে রেডক্রোস ময়দান। বিদ্রোহ, আর দু'চোখে স্বাধীনতার দৃপ্ত শ্লোগানে-শ্লোগানে যেন উপচে পরছিল রেডক্রোস ময়দান। শুধু ময়দানই নয় চারিদিকের রাস্তায় নেমে এসেছিল মানুষের ঢল। অপেক্ষমান মানুষগুলো উৎগ্রীব হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর কথা শোনার জন্য।

শেষ হলো সেই অপেক্ষার পালা। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠার সাথে-সাথেই শ্লোগান আর উল্লাসের পর মুহূর্তেই নিশ্চুপ হয়ে শুনতে লাগলো তাঁর কথা। ধারালো, দৃঢ় দ্বীপ্ত বিদ্রোহ কণ্ঠে বলতে লাগলো শেখ মুজিবুর রহমান।



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি,
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভায়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার

ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে।

আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো।

এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস, বাংলায় অত্যাচারে, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমুর্ষূ নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস-এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ এর আন্দোলনে আইয়ূব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেলো, নির্বাচন হলো।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলা নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তাদের সঙ্গে আলাপ করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো।

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

হিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেয়ার পরে এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিলো। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

কি পেলাম আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি।

আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের ওপরে, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি যে, ১০ই তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টা গোপনে বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপরে দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারেনা।

এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন- মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। আমার ভাইদের যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।

আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেইজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্ণমেন্ট দপ্তরগুলো, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না।

২৮ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে,আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল।

তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।

তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবেনা।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমাদের রিলিফ কমিটিতে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।

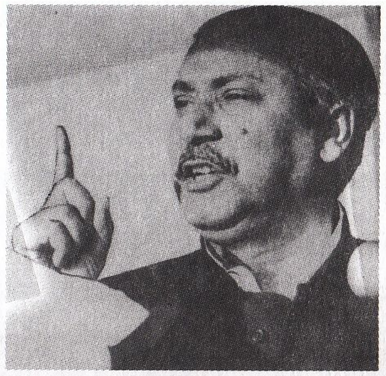
সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবেন না।

মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দুমুসলমান, বাঙালী-ননবাঙালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন। কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন।

প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।



বিভৎস সেই কালরাত্রী

৭ই মার্চে রেডক্রসের বিশাল জনসভা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অকুণ্ঠিত বক্তব্যের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আসে ঢাকায়। অবস্থা খারাপ দেখে আলোচনায় বসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না।

দফায়-দফায় ১৬ই মার্চে থেকে ২৪ মার্চে আলোচনার পর আলোচনা ভেঙ্গে যায়। শুরু হলো সামরিক সরকারে বর্বরতা। কোন কিছু না বলেই, কোন অপরাধ না দেখে, কোন কথা ছাড়াই শুরু করলো হত্যা।

২৫শে মার্চে সকাল থেকেই মিছিল আসতে শুরু করলো শেখ মুজিবের বাড়িতে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ৫০ থেকে ৬০টি মিছিল এসে জড়ো হলো ৩২ নম্বার বাড়িতে। সকাল থেকেই রাস্তায় নেমেছে আর্মি। পুরো ঢাকা শহর টহল দিচ্ছে আর্মির গাড়িগুলো।

শেখ মুজিবুর রহমান কথা বলছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সাথে। অনেকেই বলছে, আপনি এখান থেকে চলে যান। শহরে অবস্থা ভাল না। কাল আলোচনায় বসার কথা ছিল। কিন্তু কোন আলোচনায় না বসে আর্মি নামিয়ে দিয়েছে। অবস্থা ভাল ঠেকছে না। যে কোন সময় খারাপ কিছু ঘটতে পারে। আপনি চলে যান। ওরা আলোচনায় বসবে না।

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কিছুতেই যেতে চাইল না আন্ডারগ্রাউন্ডে। তিনি বললেন, আমি চোরের মতো পালিয়ে যাবো না। ওরা কি করবে? আমাকে গ্রেফতার করবে, না হলে প্রাণে মারবে। ওদের যা খুশি করুক। তবুও চোরের মতো পালিয়ে যাবো না আমি।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ সহ আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বোঝাতে লাগলেন শেখ মুজিবকে। সে যেন গা ঢাকা দিয়ে চলে যায় এ বাড়ি থেকে।

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, সামরিক জান্তাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। আমি পালিয়ে গেলে বাঙলার প্রত্যেকটি ঘর জ্বালিয়ে দেবে ওরা। বাঙলার একটি মানুষও রক্ষা পাবে না।

সারাদিন গেল একরকম উর্ধ্বশ্বাসে। দলের বিভিন্ন নেতারা তাকে বুঝাতে লাগলো। তার এক কথা, জীবন থাকতে চোরের মতো পালিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। সেখনে কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তিনি। ২৭ তারিখে সারাদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়া হলো। তিনি বললেন, ২৭-এ মার্চ হরতাল পালন হবে সারাদেশে। জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে না দেবার প্রতিবাদে।

কিন্তু সন্ধ্যের আঁধার শুরু হতেই, শুরু হলো পশ্চিমা আর্মিদের তান্ডবলীলা। আগুন জ্বলে উঠলো পুরো ঢাকা শহরে। মানুষ হলো দিশেহারা। রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। নিউমার্কেট, ইউনিভার্সিটি এলাকায় টহল দিচ্ছে আর্মি। রেডিও ষ্টেশন নিয়ে নিয়েছে আর্মিদের কড়া নিরাপত্তায়। সমস্ত শহরে ট্যাংক নিয়ে নেমে পড়েছে আর্মি। ট্যাংক চালানোর ভয়ংকর শব্দে ভয়ে কুচকে রয়েছে নিরীহ শহরবাসী।

মাঝরাতে শুরু হলো নির্মম, বর্বরোচিত সেই তান্ডব। যেন কিয়ামত শুরু হয়েছে। রাতের সবটুকু নীরবতা ভেঙ্গে অকস্মাৎ গর্জে উঠলো কামান, মর্টার, ট্যাংক, মেশিনগান, রাইফেল। পুরো ঢাকা শহর যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। ভূ-কম্পনে যেন এখনি নিমজ্জিত হবে সমস্ত পৃথিবী। আজিমপুর, নিউমার্কেট, পিলখানা, ইউনিভার্সিটি এলাকায় জ্বলছে দাউ-দাউ করে আগুন। আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে কালো ধোয়ার কুন্ডলীতে।

সেই বিদগ্ধ নগরীতে অল্প কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো মানুষের কান্না আর আহাজারি। বিদীর্ণ আর্তনাদ আর মানুষের মরণ কান্নায় যেন মনে হচ্ছিল কোন গজব নেমে এসেছে আকাশ থেকে। ওরা নাকি মুসলমান! অন্যায়ভাবে নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছে অস্ত্রহীন সাধারণ মানুষের উপর। হরণ করছে যুবতী মেয়ের যৌবন।

সেই রাতেই পশ্চিমা বর্বররা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে হামলা করলো পিলখানায় নিরস্ত্র ঘুমন্ত পুলিশ লাইন ক্যান্টনমেন্ট বাঙালী পুলিশদের উপরে। অতর্কিত সেই হামলায় ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেল হাজার-হাজার সৈনিক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নৃশংসভাবে বিনা অপরাধে মেরে ফেলা হলো তাদের। জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচল খুবই অল্পসংখ্যক সৈনিক।

জ্বালিয়ে দেয়া হলো ঢাকার বস্তিগুলো। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো মেরে ফেলা হলো ঘুমন্ত কিটের মতো। ওরা মুসলমানের দোহাই দিয়ে রাজনীতি আর

স্বার্থপরতায় মেতে উঠতে চেয়েছে বার-বার। কোন মুসলমান এভাবে মানব হত্যার উল্লাসে মেতে উঠতে পারে না। পশ্চিমা শোষক এবং তাদের বাঙালী দোসরদের নারকীয় এই হত্যাকান্ড শুধু পৃথিবীর কোন মুসলমানই নয়, অন্য কোন ধর্মের মানুষ এটা সমর্থন করবে বলে আমার মনে হয় না। কোন কারণ ছাড়াই গণহত্যা। তাও ঘুমন্ত মানুষগুলোকে রাতের অন্ধকারে। এরূপ বর্বর আফ্রিকার গভীর বনের বুনোমানুষও এইরকম করবে না, তাতে বেশির ভাগ সভ্য মানুষের সন্দেহ রয়েছে।

ইউনিভার্সিটির হলগুলো কামানের গোলার আঘাতে ধুলিস্যাৎ করে দিল পশ্চিমা আর্মি। ওদের টার্গেট যুবক ছাত্র। মেরে ফেলা হলো অসংখ্য ছাত্রদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলো হামলা করে বলৎকার করে মেরে ফেলা হলো অনেক ছাত্রীদের। আবার বহু ছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হলো ওদের নির্যাতন কক্ষে। বেগম রোকেয়া হল সহ বিভিন্ন হলের ক্যাম্পাসে মাটি খুড়ে লাশ পুতে ফেলা হলো। ঢাকা পরিণত হলো লাশের নগরীতে।

সেই রাতেই গ্রেফতার করা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২৫শে মার্চ রাতেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে।

ইয়াহিয়ার এই হিংস্র-বর্বরতা দেখে বাঙলার মানুষ হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কোনভাবেই পাকিস্তানকে অখন্ড ভাবা যায় না। একটি দেশের সরকার, সেই দেশের মানুষের উপর এভাবে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে না। সেই অন্ধকার যুগে রাজা অশোকের হত্যাযজ্ঞের চেয়েও ভয়াবহ, ইয়াহিয়ার এই রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষের উপর গুলি চালানো।

আলোচনার কথা বলেও এই বর্বরতা। দেশ স্বাধীন করেই এর জবাব দিতে হবে। বাঙলার মানুষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিল ২৫শে মার্চের পর থেকে। যেভাবেই হোক পশ্চিমা বর্বরদের কাছ থেকে নিজেদের বাঁচাতেই হবে।

এরই মধ্যে ঢাকা শহর ত্যাগ করে নিরাপদে চলে আসতে লাগলো আওয়ামী লীগ সব বিভিন্ন ইউনিটের লোকজন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ঢাকার বাহিরের শহরগুলোতে অবস্থান করতে লাগলো সকলেই। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

২৫শে মার্চে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা পত্র পাঠ করেন মেজর জিয়াউর রহমান। এবং তিনি তার জোয়ানদের নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন।



যুদ্ধ

২৫শে মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করার পর এবং সেই রাতে পাকিস্তানিদের নির্বিচারে বাঙালীদের গণহত্যার পর বাঙালী বেছে নিল একমাত্র যুদ্ধের পথ। স্বাধীনতাকামী মানুষ ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, দিনমজুর, যুবক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি সর্বস্থরের মানুষ এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিযুদ্ধে।

রাজনৈতিক কর্মীরা শহর ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিল গ্রামে। কেউ-কেউ সীমান্ত এলাকা পার হয়ে ভারতে গিয়ে এক হতে শুরু করলো যুদ্ধের জন্য। এরই মধ্যে কোথায়-কোথায় বাঙলার সৈনিক বাহিনী, পুলিশ, আনছার, ছোট দল গঠন করে চালিয়ে যেতে লাগলো যুদ্ধ। মেজর জিয়াউর রহমান তখন তার দল নিয়ে অবস্থান করছিলেন চট্টগ্রামে।

২৬-২৭ তারিখের পর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে এসে যোগ দিতে লাগলো ছাত্র, যুবক এবং সাধারণ জনতা। কিন্তু যুদ্ধের জন্য এখনো তাদের সংখ্যা খুবই কম। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার ইচ্ছে থাকলেও যুদ্ধে আসতে পারছে না। বা যোগাযোগ করতে পারছে না কারো সাথে। কারণ তখনো সব ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায়। মানুষের হাতে অস্ত্র নেই।

তখন শুধুমাত্র ৫টি ব্যাটালিয়ন কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধ। কোথাও-কোথাও পশ্চিমাদের প্রতিরোধ গড়তে লাগলো তারা। ধীরে-ধীরে তাদের সাথে যোগ দিল ই.পি.আর, আনসার, পুলিশ, এবং অল্প সংখ্যক ছাত্র-জনতা। কমান্ডারগণ ছাত্র এবং যুবকদের অল্পকিছু ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করতে থাকে যুদ্ধের জন্য। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক অভিজ্ঞ-অনভিজ্ঞ যোদ্ধা নিয়ে পশ্চিমা আর্মিদের মোকাবেলা দুরহ হয়ে পড়ে।

তাই যুদ্ধে জয় লাভের জন্য গেরিলা পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চলতে থাকে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি। এই গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া দেশ স্বাধীন

করা সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমা শত্রুপক্ষের আছে বিশাল বাহিনী। তাছাড়া বিমান বাহিনী সহ জল স্থলেও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তারা।

এরই মধ্যে কর্ণেল ওসমানীর নেতৃত্বে দু'লক্ষ গেরিলা ও ২৫ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা হলো। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কমান্ডারদের অধীনে যে সমস্ত মুক্তি ফৌজ রয়েছে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো।

ভারতে সদ্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র, যুবকদের নিয়ে গঠিত হলো মুক্তিসেনা। এই ভাবে ভারত থেকে ট্রেনিং দিয়ে ছোট-ছোট এক-একটি গ্রুপ যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো বাংলাদেশে। যুদ্ধের জন্য নেয়া হলো বিভিন্ন কৌশল। জল ও স্থলে যুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দেয়া হলো মুক্তিযোদ্ধাদের। আকাশ পথে যুদ্ধ করার মতো কিছুই নেই বাঙালীদের হাতে।

যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র বাঙলার রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সেক্টরগুলোর তত্ত্বাবধানে থাকবে সেক্টর কমান্ডার। সেই সেক্টর হেডকোয়ার্টার থাকবে বাংলাদেশের ভিতরে মুক্ত এলাকাগুলোতে, আর সেক্টরগুলোর হেড অফিস থাকবে গেরিলা যুদ্ধের মূল ভিত্তি।

কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনা জন্য নির্দিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি দরকার। এবং সরকার গঠন করা অতি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই ধারাবাহিকতায় মার্চের শেষ কটি দিন পার হয়ে এপ্রিলের ১০ তারিখে বাঙলার সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতে গঠন করা হলো প্রবাসী সরকার।

তখন কোন খোঁজ খবর নেই শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি বেঁচে আছেন না কি পশ্চিমারা তাকে মেরে ফেলেছে তাও কেউ জানে না। তবুও শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রপতি।

অস্থায়ী রাষ্টপতি হলেন-সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী হলেন-তাজউদ্দিন আহমদ।

আইন ও পররাষ্টমন্ত্রী হলেন-খন্দকার মোস্তাক আহমেদ।

অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হলেন-এম মনসুর আলী।

স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রাণলায়ের দায়িত্বে ছিলেন-এইচ. এম কামরুজ্জামান। এবং প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পেলেন- কর্ণেল (অবঃ) এম. এ. জি ওসমানী।

প্রবাসী সরকার গঠনের পর ঘোষণা হলো ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর বৈদ্যনাথতলায় আনুষ্ঠানিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এই খবর পৌঁছে গেল বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য, ১৭ই এপ্রিল সকাল থেকেই মানুষ জড়ো হতে থাকে মেহেরপুর অম্র কাননে। বহু দেশি বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ১০টার দিকে শুরু হলো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ গ্রহণের পর বৈদ্যনাথতলার নাম দেয়া হলো মুজিব নগর। এবং প্রবাসী বাঙলাদেশ সরকার পরিচিত হলো মুজিব নগর সরকার নামে।

তার পর বিদেশী সাংবাদিকদের সম্মুখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বললেন, আজ থেকে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। যে কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা রক্ষা করবো আমাদের সার্বভৌমত্ব। ৫২-তে রক্ষা করেছি মায়ের মুখে ভাষা। এখন অবশ্যই আমরা রক্ষা করবো মাতৃভূমি। ইনশাআল্লাহ।

ঐতিহাসিক দলিল পাঠ করলো চিফ হুইফ ইউসুফ আলী। আকাশবাণীর সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে এবং প্রধানমন্ত্রীকে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, সবাইকে দেশ রক্ষার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি।

এর মধ্যে পাকিস্তান থেকে আসা বহু বাঙালী সেনা যোগ দিল মুক্তিযুদ্ধে। আর বাঙালী ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষের জন্য ভারতে খোলা হলো যুদ্ধ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হতো যুদ্ধ করতে।

পুরো বাঙলাদেশ যে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হলো তা হলো–

সেক্টর-১ ঃ চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং নোয়াখালি জেলার কিছু অংশ।

এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর জিয়াউর রহমান। তার সাথে যুদ্ধরত ছিল ইষ্টরেঙ্গল রেজিমেন্টের কতিপয় সেনা, ইপিআর, পুলিশ এবং আনসার বাহিনী।

সেক্টর-২ ঃ কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা এবং নোয়াখালির কিছু অংশ।

এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর খালেদ মোশাররফ।

সেক্টর-৩ ঃ সিলেটের কিছু অংশ, কুমিল্লার কিছু অংশ এবং ঢাকার কিছু অংশ।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর মোঃ সফিউল্লাহ্।
সেক্টর-৪ ঃ সিলেট সদর এবং হবিগঞ্জ।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত।
সেক্টর-৫ ঃ সিলেট জেলার উত্তরাঞ্চল।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর মীর শওকত আলী।
সেক্টর-৬ ঃ রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, উইং কমান্ডার এম, কে বাশার।
সেক্টর -৭ ঃ রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর নাজমুল হক।
সেক্টর-৮ ঃ কুষ্টিয়া, খুলনা, পটুয়াখালী।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর ওসমান চৌধুরী।
সেক্টর-৯ ঃ রবিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনার কিছু অংশ।
এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর এম এ জলিল।
সেক্টর-১০, এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর রফিকুল ইসলাম।
সেক্টর-১১, এর সামরিক অধিনায়ক ছিলেন, মেজর তাহের।

এই ১১টি সেক্টরে ভাগ করে পুরো বাঙলা সৃষ্টি হলো রণাঙ্গনের ক্ষেত্র। বাঙলার দামাল ছেলেরা। ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে লাগলো বিপুল বিক্রমে। কখনো সম্মুখ যুদ্ধ আবার কখনো ফাঁদ পেতে ধ্বংস করতে লাগলো পশ্চিমা হানাদার বাহিনীকে।

বাঙলার প্রায় ৯৮ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশ নিল এই মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু মীর জাফরের মতো দেশ ও জাতীর শত্রু যেন চিরকালই রয়ে যায় পৃথিবীর বুকে।

তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এই বাঙলার মাটিতে, বাঙালী সন্তানদের মধ্যে থেকে কেউ-কেউ ক্ষমতাপিপাসু, বর্বর এবং পাকিস্তানের দোসরদের নিয়ে গঠন করলো, রাজাকার, আলবদর, পিচকমিটি। কি রকম নিচু হীন মানসিকতার মানুষ ছিল তারা। যখন সমস্ত দেশ মুক্তির নেশায় পাগল তখন তারা...

প্রিয় পাঠক, হৃদয়ের আবেগময় কোন মুহূর্তের কথা লিখছি না। যা সত্য, তার ছিটেফোঁটাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা মাত্র। বাঙলার প্রতিটি ঘরে যখন আগুন, প্রতিঘরের যুবক ছেলেটি যখন স্বাধীনতার নেসায় মায়ের বুক

থেকে চলেছে রণাঙ্গনের মাঠে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীদের দ্বারা যখন ধর্ষিতা হচ্ছে বাঙলার মা-বোন, বাঙলার নারীকে যখন তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হচ্ছে অন্ধকার কোন নির্জন কক্ষে। সেখানে অবরুদ্ধ রেখে অবলীলায় পশুর মতো নির্যাতন চালাচ্ছে দিনের পর দিন। বাঙলার কোন যুবক ছেলেদের দেখলেই গুলি করে মারছে নির্বিচারে, ছেলের সম্মুখে কেড়ে নেয়া হচ্ছে মায়ের সম্ভ্রম। স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আঁস্তাকুড়ে। জীবন্ত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বহু মানুষ। বাঙলার মানুষের রক্ত আর বিকৃত যৌবন পিপাসু পশ্চিমারা যখন মেতে উঠেছে ফুর্তিতে, তখন বাঙলার প্রতিটি মায়ের চোখে জল। ছেলে তার যুদ্ধে গেছে। ফিরে আসবে কি আসবে জানা নেই তার।

আর তখন বাঙলার ছেলে হয়েও পাকিস্তানী দোসর আলবদর, রাজকাররা পাকিস্তানীদের সাথে মেতে উঠেছে ফূর্তিতে। বাঙলার মুক্তিকামী মানুষগুলোর খবর এনে দিয়েছে বর্বর পাকিস্তানীদের কাছে। পাকিস্তানীদের এই রূপ ঔদ্ধত্য আচরণের সাথে যোগ দিয়েছে তারা। ধিক, শত ধিক তাদের।

কিন্তু বাঙালী মায়ের সন্তানেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নিজের দেশকে মুক্ত করতে। পূর্ণ স্বাধীন অর্জন করে এই অত্যাচারের সমুচীন জবাব দেবার জন্যই এক হয়ে লড়ছে রণাঙ্গনের মাঠে। তাই বাঙলার বুকের প্রতিটি রণাঙ্গনে তাদের বিজয়।

এ যেন আকাশ থেকে তারা খয়ে পড়া কোন উল্কা।
এ যেন শ্রাবণ ঘন কালো মেঘের বুকে,
উদ্দমান কোন অনিরুদ্ধ দমকা হাওয়া।
এ যেন সমুদ্র-অতলে চঞ্চলিত কোন ঝঞ্ঝা-আবেগ।
এ যেন মুষ্টিবদ্ধ অপরাজেও শত-সহস্র-লক্ষ হাত।
এ যেন উন্নত শিরে বেড়ে উঠা, অশনি
মাখা অমুল্য সহস্র জোড়া চোখ।
এ যেন মুক্তি পাগল স্বাধীন জনতা,
দুর্বার, দুর্নিমিত, অকুন্ঠিত, বিমূর্ত, অমূর্ত,
দেশ বিমোহিত, অপরাজেয়, অনিরুদ্ধ
আমাদের মুক্তি সেনা।

স্বাধীন চিত্তে যার দেহঘর।
সে নির্বাক, নির্বান, স্বাধীনতা আলিঙ্গনের প্রত্যাশায়
সে অনির্বাণ।
কণ্ঠে তার মুক্তির গান।
হাতে রাইফেল ষ্টেনগান।
সে মুক্তি, সে মুক্তি স্বাধীন,
সে মানবেই না কোন;
শৃংখলিত পরাধীন।

বাঙলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরেও যুদ্ধ করে গেছেন বহু মুক্তি পাগল বাঙালী বীর সন্তান। কারণ কেউ চেয়ে থাকে নি কারো দিকে। সবারই লক্ষ এই দেশকে স্বাধীন করা। এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে 'মুজিব বাহিনী'। এই বাহিনীতে প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার মুক্তিসেনা যুদ্ধ করেছে। এই বাহিনীর সংগঠক ছিলেন, শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহ্মদ।

টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকী ওরফে বাঘা সিদ্দিকী নিজের চেষ্টায় গঠন করেন মুক্তিবাহিনী। যারা কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত ছিল। ধীরে-ধীরে এই কাদেরিয়া বাহিনী প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার মুক্তিযোদ্ধায় যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। টাঙ্গাইল এবং ময়মনসিংহের প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছিল তার দখলে। পাকিস্তানীরা কোনমতেই ঢুকতে পারে নি সেখানে।

আরো বহু মুক্তি পাগল মানুষ যুদ্ধে গেছেন নিজের মতোই। বঙ্গবন্ধু ও বাঙলাদেশকে ভালবেসে। তাদের মধ্যে সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জার বাহিনী, পিরোজপুরের রফিক বাহিনী, মেহেন্দীগঞ্জের কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী, আকতার বাহিনী এবং স্বরূপকাঠির জাহাঙ্গীর বাহাদুর বাহিনী। তারা সকলেই যুদ্ধ করতে থাকে প্রাণপণে।

স্বাধীন বাঙলাদেশ গঠনের পর সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড, তথ্য, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি, যোদ্ধা এবং বাঙলার মানুষকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগাতে প্রচার মাধ্যম স্থাপন করা হলো, স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র। এর প্রচার দপ্তর ছিল কলকাতার ৯নং সার্কাস এভিনিউতে। এই প্রচার মাধ্যমে কর্মরত ছিলেন, আব্দুল মান্নান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জায়দুল করিম, আমিনুল হক বাদল এবং মুকুল সহ অনেকেই।

এই প্রচার দপ্তর থেকে সরকারের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশ করা হলো সাপ্তাহিক পত্রিকা, 'জয়বাঙলা'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, অধ্যাপক আব্দুল গফুর। ১১ই মে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হলো 'জয়বাঙলা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশনা। 'জয়বাঙলা' পত্রিকার যোগাযোগ ঠিকানা ছিল, ২১/এ, বালু হাক্কার লেন, কলকাতা-১৭।

স্বাধীন বাঙলা বেতার কেন্দ্র এবং জয়বাঙলা পত্রিকার ভূমিকা ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধে অপরিসীম। পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙালীদের বীরত্বের কথা এবং বিভিন্ন গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটিকা রণাঙ্গনের শক্তি যুগিয়েছে পুরোপুরিভাবে।

স্বাধীন বাঙলা বেতার থেকে প্রচারিত হতো বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সংবাদ। বাঙলার মানুষ শুনতো বীরদের রণাঙ্গনের সেই কাহিনী আর প্রচারিত হতো দেশের গান। 'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি' সত্যি সেই সব গান পুরো বাঙালী জাতিকে সেদিন গেঁথেছিল একই সূতোয়। আর রণাঙ্গনের বীরদের দিয়েছিল অসীম সাহস।

একই সাথে জ্বলে ওঠা স্ফুলিঙ্গের সহস্র কনার তীব্র স্রোতে মাত্র ন'মাসে শত্রু মুক্ত হয়েছিল দেশে। কিন্তু এই নয়টি মাসেই বাঙলাকে হারাতে হয়েছে অনেক কিছু। তবুও যতটা না হারিয়েছে পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বাধীনতা।

জয়বাঙলার পর আরো বেশ কিছু পত্রিকা বের হলো। বাঙলার মুখ, স্ফুলিংগ, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযোদ্ধা, বাংলার বাণী, বাঙলাদেশ, জাগ্রত বাংলা, স্বদেশ, নতুন বাংলা, বিপ্লবী, মুক্তি, দাবানল, অগ্নিবান, রণাঙ্গন, মায়ের ডাক, দেশ বাংলা, জন্মভূমি এবং আরো অনেকগুলো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথমে কালুরঘাট তারপর আগরতলা তারও কিছু পরে কলকাতার ৫৭/৮-এর বালীগঞ্জের সার্কুলার রোড থেকে প্রচারিত হতে থাকে স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান।

সেখান থেকেই প্রচারিত হতো সেই সব গান। যে গানে মায়ায় জড়ানো প্রতিটি অক্ষর বাঙলার কখন যেন পুরো বাঙালীকে নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতার কাছে। 'আমার সোনার বাঙলা আমি তোমায় ভালবাসি, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, 'জয়বাংলা বাংলার জয়, আরো বাজানো হতো নজরুলের সেই অগ্নি-অক্ষরিত যুদ্ধে জয়ের গান। 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙ্গে ফ্যাল করলে লোপাট'।

হায়রে যুদ্ধ। এই স্বাধীন বাঙলা বেতারের অনুষ্ঠানগুলো শুনতেন বাঙলার মানুষ। লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনেও প্রাণে মরছে কত মানুষ। শুধুমাত্র স্বাধীন বাঙলা বেতারের অনুষ্ঠান শোনার অপরাধে জীবন দিতে হয়েছে বহু বাঙালীর। তবুও গভীর রাতে মা কানের কাছে রেডিওটি নিয়ে শুনতেন স্বাধীন বাঙলা বেতার। সেখানেই যে আছে তার খোকার খবর। উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন বোন বাবা। কখন খবর হবে বেতারের। জীবন যাবে যাক। তবুও যে খোকার খবর শোনার জন্য অপেক্ষমান বাঙলার প্রত্যেকটি মা-বাবা।

৭১-এ বাঙলার প্রতিটি জনপথ হয়েছে রক্তাক্ত। প্রতিটি মেঠোপথ সিক্ত হয়েছে মায়ের অশ্রুজলে। জন্মভূমি রক্ষা করতে গিয়ে মায়ের একমাত্র বুকের ধন চলে গছে যুদ্ধে। কত কষ্টে মা তার এক মাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন, তার খোকাকে পাঠিয়েছে দেশ থেকে শত্রু তাড়াতে। মা জানেন হয়তো শত্রু মুক্ত করে একদিন ফিরবে তার খোকা, হয়তো ফিরবে না।

তবুও দেশকে মুক্ত করার জন্য তিনি বিসর্জন দিয়েছেন জীবনের সব। সন্তান হারিয়েও কোন অভিযোগ নেই মায়ের। দেশকে শত্রু মুক্ত করতে প্রাণ দিয়েছে তাঁর ছেলে।

৭১-এর সেই ভয়াল দিনগুলিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা চালাতে লাগলো হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, নির্যাতন। ছেলে যুদ্ধে গেছে শুনলেই মেরে ফেলা হতো তার বাবা-মাকে। জ্বালিয়ে দেয়া হতো বাড়ি। লুন্ঠিত হতো মুক্তিযোদ্ধার সর্বস্ব।

মুক্তিযোদ্ধাদের পেলে ধরে নিয়ে আটকে রেখে অমানসিক নির্যাতন চালানো হতো তাদের উপর। বাঙালী রাজার **অমানুষগুলো** এই সব কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে লাগলো পাকিস্তানিদের। অথচ মুখে তাদের ছিল ধর্মের দোহাই। এই মানুষ পশুত্বের কোন পর্যায় পড়লে বিনা অপরাধে হত্যা করে মানুষ ? বিষধর সাপও আঘাতপ্রাপ্ত না হলে কাউকে দংশন করে না। কিন্তু পাকিস্তানী ও তাদের দোসর বাঙালী রাজাকার করেছে একাত্তরে।

পাকিস্তানী দোসররা ভাবতে লাগলো দেশ বুঝি মুক্ত করতে পারবে না বাঙলার মুক্তকামি মানুষ। দেশটাকে চুষে খাবে ওরা। ওদের ইচ্ছে মতো চলতে হবে সবাইকে। তাই ওদের লোলুপ দৃষ্টিতে পুরে গেছে শত সহস্র বাঙলার মানুষ। ওদের নির্যাতনের ভয়াবহতায় অবুঝ শিশুও ভয়ে ঘুমিয়ে পড়তো বিনা বায়নায়।

এই দেশের প্রতিটি মানুষ জানেন পাকিস্তানীদের বর্বরতার কথা। আওয়ামী লীগের নাম শুনলেই জ্বালীয়ে দেয়া হতো গ্রামের পর গ্রাম।

মানুষকে করেছে গৃহহীন। ওদের নির্যাতন কক্ষে আটকে রেখে দিনের পর দিন নির্যাতন করেছে বাঙলার মানুষকে। আর এই সবই করছে রাজাকারদের সক্রিয় সহযোগিতায়।

ওদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এদেশ থেকে ভারতের দিকে হেঁটেছে বহু মানুষ। হাজার-হাজার মানুষ পায়ে হেটে দিনের পর দিন কষ্ট করে, অভুক্ত থেকে আশ্রয় নিয়েছে ভারতের উদবাস্তু বস্তিতে।

প্রিয় পাঠক, এর পূর্বে আমি আরো একবার বলেছি, যুদ্ধ সম্বন্ধে পাকিস্তানী এবং তাদের বাঙালী দোসরদের বর্বরতা আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী কোন আবেগময়ের মোহে লিখছি না। সত্য সব ঘটনার ছিটেফোঁটাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এত বেশি ছিল, তা তুলে ধরতে হলে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায়ও শেষ হবে না।

কত মানুষ মরেছে না খেয়ে। কত মানুষ মরেছে নির্বিচারে পাকিস্তানীদের গুলিতে। কত মানুষ মরেছে যুদ্ধে গিয়ে। কত মানুষ মরেছে পাকিস্তানী বর্বরতায়। কত বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে, কত মায়ের দু'চোখ অন্ধ হয়েছে কেঁদে-কেঁদে। কত বাবা গুলি খেয়েছে মুক্তিযোদ্ধার বাবা বলে। কত স্ত্রী লাঞ্ছিত হয়েছে, তার পরে এসেছে স্বাধীনতা।

কোন এক প্রভাতে নতুন সূর্য হাতে,
কোন এক কিশোর উচ্ছ্বাসিত খবর জানিয়ে গেলো;
এসেছে স্বাধীনতা।
কোন এক নব-যুবার উদ্দাম গ্রন্থীলের উন্মাদনা
আর পৃথিবী ফাটানো চিৎকারে মানুষ শুনতে পেলো,
এসেছে স্বাধীনতা।
সন্তান ফিরে আসার প্রত্যাশায়,
দীর্ঘ-দীর্ঘ দিনে বিনিদ্র অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মায়ের
বাক্য, 'কই, আমার খোকা এসেছে?,
মায়ের সেই সকরুণ কণ্ঠ আরো রোদনে,
মানুষ জেনেছে, এসেছে স্বাধীনতা।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। ভারতের সেনাপতি জগজিৎ সিং অরোরা শাস্ত্রীর কাছে আনুষ্ঠানিক আত্মসর্মপণ করলো নিয়াজী। এর মধ্যে দিয়ে শেষ হলো বাঙলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। সম্পূর্ণ স্বাধীন হলো বাঙলাদেশ।



দেশে ফেরা

দীর্ঘ ন'মাস বহু ত্যাগ ও বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন হলো বাংলাদেশ। বাংলার মানুষ পেল স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র। যার আছে একটি নিজেস্ব ভূখন্ড, সাংস্কৃতি, ভাষা, অক্ষর এবং একটি পতাকা। জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত পেল বাঙালীর বাঙলাদেশ।

৭১-এর ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী আর্মি গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কারাগারে রাখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই দীর্ঘ ন'মাস বঙ্গবন্ধুকে অবরুদ্ধ রাখার সময়, বহুবার তাকে মেরে ফেলার জন্য প্রস্তুতি নিল পাকিস্তনীরা।

কিন্তু বিধাতার অসীম করুণা আর বহির বিশ্বের চাপে বিশ্বনন্দিত এই নেতাকে মারতে পারলো না পাকিস্তনীরা। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর ৮ তারিখে মুক্তি দেয়া হলো তাকে। জানুয়ারীর ১০ তারিখে দেশে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙলার মানুষের অতি প্রিয় এই মানুষটি দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রভার গ্রহণ করলেন। রাষ্ট্রপতির পদ বাদ দিয়ে জানুয়ারীর ১২ তারিখে তিনি গ্রহণ কররেন প্রধানমন্ত্রীর পদ। তিনি স্বাধীন বাঙলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আর তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর তিনি তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নেবার লক্ষে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বললেন, অস্ত্র সমর্পণ করতে। এবং তার কথায় বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধারাই অস্ত্র সমর্পণ করলো। হয়তো কেউ-কেউ আবার অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করলো।

স্বাধীনতার পর-পর যুদ্ধবিরোধী রাজাকারদের নিয়ে জনমনে দেখা দেয় বিরাট অসন্তোষ। ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য জেগে ওঠে সাধারণ মানুষ এবং মুক্তিযোদ্ধারা। শেখ মুজিব তার উদার মানসিকতায় প্রতিফলন ঘটিয়ে সাধারণ ক্ষমায় মাফ করে দেন সকলকেই।

এরই মধ্যে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে রচিত হয় স্বাধীন বাঙলাদেশের সংবিধান। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরেপেক্ষতাকে মূলনীতি করে রচিত হলো স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাঙলাদেশ সংবিধান।

পারিবারিক জীবন

বাঙলার সেই ছোট্ট পুরাতন মায়ায় ভরা জনপথ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর জন্ম। সবুজ-শ্যামলে ঢাকা প্রকৃতির সাথে বেড়ে উঠা শেখ মুজিবের মন ছিল সাধারণ প্রকৃতির মতোই সহজ-সরল। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটিয়েছেন তিনি।

তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে নিয়ে চমৎকার সুখেই ছিলেন তিনি। সংসার জীবনের শুরু থেকেই বেগম ফজিলাতুন্নেসা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হয়ে নিজের হাতেই আগলে রেখেছেন সংসারটাকে।

বিধাতার এই পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম পরিচয় থাকে মানুষের। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ। সেটি তার পেশাগত পরিচয়। সংসারের বাহিরের একটি রূপ। সেই পরিচয় বাদ দিয়েও একটি পুরুষ একই সাথে হয় স্বামী এবং পিতা। একটি নারী হয় স্ত্রী এবং মাতা।

কখনো কখনো একজন মানুষ তার কর্মে, সফল করে তার ব্যক্তিগত জীবনকে। কিন্তু সংসার জীবনে তিনি হয়ে পড়েন ব্যর্থ। এমন অনেক গুণী মানুষ আছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে খুবই সফল। কিন্তু পারিবারিক জীবনে স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে অসুখি বা সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ।

বেগম ফজিলাতুন্নেসার গভীর ঘনিষ্টতা আর ভালবাসায় গড়ে উঠেছিল শেখ মুজিবের সংসার। সেই সংসারেই জন্ম হয় শেখ কামাল, শেখ হাসিনা, শেখ জামাল, শেখ রেহানা এবং সবার প্রিয় শেখ রাসেলের। যেন একটি বৃন্তে উন্নত উৎগত পাঁচটি ফুল।

জীবনে দীর্ঘ সময় জেল জুলুম আর মেহনতি মানুষের কথা বলে-বলে কাটিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। হয়তো অনেক সময় নিজের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীর দিকেই খেয়াল করার সুযোগ ছিল না তার। তবুও পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন সুখি। তার কারণ তাঁর পাশে ছিলেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা।

কখনো কোন অভিযোগ করেননি তিনি। বরং মানুষের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন মুজিবকে। এই সংসারে ক'জনই মেলে এই উদারতায় ভরা মন। ছেলে মেয়েদের মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন তিনি। অনেক ক্ষমতার মধ্যে থেকেও বকে জান নি কেউ। সেও কি একটি মানুষের জন্য কম সফলতা।

দেশ পরিচালনা

শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ পরিচালনা নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক থাকলেও, তখনকার প্রেক্ষাপট নিয়ে একটু ভাবলেই পরিস্কার হয়ে যায়। কতটা ভুল বা কতটা শুদ্ধতা ছিল তার রাষ্ট্র পরিচালনা।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যায় দারিদ্র্যতার সাথে। অভাব মানুষকে বাধ্য করে বিবেক বিসর্জনে। তেমনি এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাঙলাদেশ নামক একটি নতুন দেশের জন্ম এবং পথ চলা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশটি দারিদ্র্যপ্রীত থেকে ভিন্ন ছিল না। শুরু থেকেই পাকিস্তানীদের শোষণ, নির্যাতন ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সহ সব ক্ষেত্রে বৈষম্যতার স্বীকার। এবং তার পর দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ চলার পর একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিল বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। এই সব সারিয়ে উঠতে সময়ের প্রয়োজন ছিল।

তার উপর যুদ্ধ চলাকলিন সময় মুক্তিবাহিনী এবং যুদ্ধ বিরোধীদের হাতে ছিল বিপুল অস্ত্র। স্বাধীনতা উত্তর কালে সেই সব অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে সরকারে অধীনস্ত করা সম্ভব ছিল না। এটা শুধু বাঙলাদেশেই নয়। পৃথিবীর সব দেশের ব্যাপারেই এই সমস্যা বিদ্যমান।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন চরম বিপর্যয়। মানুষের কাছে অস্ত্র আর ক্ষমতার আধিপত্য নিয়ে মানুষ মধ্যেকার লড়াইয়ের জন্য সৃষ্ট অরাজতা, কঠিনভাবে তা দমনের চেষ্টা করেন বঙ্গবন্ধু।

কিন্তু একটি মানুষের পক্ষে কতটাই বা সম্ভব ছিল। যে দেশের বেশির ভাগ মানুষ ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন, অসচেতন। তাই তখন দেশের মধ্যে শুরু হলো দারুণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, গুপ্তহত্যা, ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যতা।

কিছু মানুষের মধ্যে দেখা দিল অসাধুতা, অসততা। মূলত স্বার্থলোভী মানুষগুলোর জন্য দেশে সৃষ্টি হয় চরম সমস্যার। প্রত্যেকটি সেক্টরেই দেখা দেয় ক্ষমতার অপব্যবহার।

বরাবরই বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার মানসিকতার। তিনি যখন দেশ গড়ার কাজে সম্পূর্ণ ব্যস্ত। তখন দেশের মানুষ বা স্বার্থলোভী নিজ দলের মানুষের ক্ষমতার অপব্যবহারে কখনো-কখনো হতাশ হন তিনি। কাদের নিয়ে দেশ গড়বেন তিনি। যাদের নিয়ে দেশ গড়বেন তারাই নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু এই কারণে ধীরে-ধীরে দেশের অবস্থা কিছুটা খারাপ হতে থাকে। এমনিতেই এই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল দারুণভাবে বিপর্যস্ত।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদর্শী ভাবনা দিয়ে বুঝে নিতে পারতেন অনেক কিছুই। তাই দেশের সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াতেন তিনি। তবুও কখনো-কখনো তৈরী হতো নানা রকম সমস্যার। এই বিশাল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র আয়তনের একটি দেশ পরিচালনা খুব সহজ ছিল না। বিশেষ করে যখন কাছের লোকগুলোকে কাজের জন্য পাওয়া যেতো না আশানুরূপভাবে।

১৯৭২ সালের ৬ই মে ডাকসুর পক্ষ থেকে ডাকসুর আজীবন সম্মাননার পদে ভূষিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে তিনি লাভ করেন জুলিও-কুরি শান্তি পুরস্কার।

বাঙলাদেশের গণতন্ত্রকে অটুট রাখার জন্য দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৩ সালে তিনি ঘোষণা করলেন স্বাধীন বাঙলার প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সেই নির্বাচনেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ।

এরপর দেশের পরির্বতন হতে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ব্যাংক, বীমা, বড়-বড় শিল্প-কালকারখানাকে করা হয় জাতীয়করণ। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাও জাতীয়করণের আওতায় আসে তখন।

কিন্তু দেশের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাবান স্বার্থপর মানুষের কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে হু-হু করে। এই কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করে ব্যবসায়ীরা হাতিয়ে নেয় লক্ষ-লক্ষ টাকা। কিন্তু তাতে দেশ যেতে থাকে একটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সাথে দেশে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের।

তখন শক্ত হাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন শেখ মুজিবুর রহমান। এরপর ১৯৭৪ সালে দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন তিনি।

এত ত্যাগ-তিতিক্ষার পরে যে স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে বাঙলার মানুষ তাতে সোনার বাঙলায় রূপ দিতে তখনো দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু দেখতেন নতুন কোন স্বপ্ন। নতুন কোন পথের দিকে দেশটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। যেখানে অধিকার থাকবে কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের। যাদের জন্য আজীবন যুদ্ধ করে কারারুদ্ধ হয়ে বহু অত্যাচার সহ্য করেছেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২-এর সংবিধানের পরির্বতন আনা হলো। এবং তার ফলে পার্লামেন্টারী সরকারের বিলুপ্তি করে সৃষ্টি করা হলো প্রেসিডেন্টসিয়াল সরকারের। শেখ মুজিবুর রহমান হলেন প্রেসিডেন্ট।

১৯৭৫ সালেই ৭ই জুন আওয়ামী লীগের সমাপ্তি টেনে নতুন দল গঠন করলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দলেন নাম দেয়া হলো 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ'। যার সংক্ষিপ্ত নাম দেয়া হলো 'বাকশাল'।

তারপর ১৯শে জুন সকল মহাকুমাকে জেলা ঘোষণা করেন তিনি। এর পূর্ব রক্ষিবাহিনী গঠন করে দেশ গড়ার কাজে লাগালেন তাদের। কিন্তু রক্ষীবাহিনী ক্ষমতা পেয়ে কিছু অসৎ মানুষ শুরু করে বিভিন্ন অসৎ কাজ। যার জন্য মনে সৃষ্টি করে বিশাল ক্ষোভের। এবং বিতর্কিত হতে থাকে রক্ষীবাহিনী। প্রশ্নবিদ্য হয় অনেক কিছুই।

একটি দেশ স্বাধীনতার পর-পর তাকে এগিয়ে নেবার জন্য শুধু মাত্র রাষ্ট নায়কই যথেষ্ট নয়। তার জন্য দেশের প্রত্যেকাটি মানুষকেই কাজ করতে হয় কাঁদে-কাঁদ মিলিয়ে।

যেমনি একটি বিধ্বস্ত পরিবার যদি শুধুমাত্র পিতার কাঁদেই চাপিয়ে দেয়া হয় সংসারের ঘানি। আর সংসারের অন্য সকল সদস্য বসে থাকে নির্বিকার তার উপর হয়ে উঠে অবাধ্য। তাহলে সেই পিতা একা সংসারে ঘানি কতটাই বা বয়ে বেড়াতে পারে। তার চেষ্টা থাকে শত ভাগ। কারণ সংসারের জন্য পিতার দরদ বড় কম নয়। নিজের হাতে গড়া সংসারটা নিজের সম্মুখে ধ্বংস হবে, তা চান না কোন পাষন্ড বাবা।

কিন্তু সংসারের লোকগুলো যখন তাকে সাহায্য না করে বরং বিরোধীতা করতে থাকে। তখন সেখানে ক্ষুদ্র, দারিদ্র, নৈরাজ্য, অসস্তি নিত্যদিনের হয়ে পড়ে। তবুও জীবনের সবটুকু দিয়ে পরম আদরের সংসার আগলে রাখতে চান পিতা।

শেখ মুজিবুর রহমান তেমনি একজন পিতা। বাঙলাকে তার নিজের সংসার ছাড়া কিছুই ভাবেননি তিনি। তাইতো জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়েও রেখে গেছে বাঙলার মানুষের জন্য। তিনি চাইতেন এদেশের মানুষ আর অত্যাচারিত হবে না। অবহেলায় থাকবে না। হয়তো খুব অল্পদিনে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমি বলবো তার স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। সম্পূর্ণ না হলেও শোষণ এবং নির্যাতনের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে বাঙলাদেশ। বাঙলার মানুষ এখন বুঝতে শিখেছে। জানতে শিখেছে অনেক কিছুই। তাদের অধিকার তারা বোঝে। হয়তো কখনো পায়, আবার কখনো পাওয়া হয় না।



বঙ্গবন্ধু ও নজরুল

পৃথিবীতে যে ক'জন বিদ্রোহী করি জন্ম হয়েছে তাদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম অন্যতম। ম্যাক্সিম গোর্কি লিখতেন মাটির মানুষদের নিয়ে। নিপীড়িত মানুষের কথা লিখে বহুবার নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তিনি। সারাদিন ধরে একটি ওয়ার্কসপে হারভাঙ্গা পরিশ্রম করে নিশুতি রাতে মানুষের কথা লিখতেন গোর্কি।

আর নজরুল তার বিদ্রোহী লিখনিতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বুকের ভেতর জমে থাকা আগুন। তিনি মানুষকে দেখতেন মানুষ রূপেই। বৈশ্যতা শক্ত শৃংখল আর আগ্রাসনী কঠিন পলেস্তারা তিনি ভাঙ্গতে চেয়েছেন তার লিখনিতে। যে মানুষটির একাডেমিক শিক্ষা বলতে কিছুই নেই। তার লিখনির ধারা যে অবর্ণনীয়। এ যে বিধাতার দান। যেন নিজ হাতে তার অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছেন বিধাতা।

ছেলেবেলায় ভাতের কষ্টে অভুক্ত থেকেছেন নজরুল। তার অন্তর থেকে উৎগত বহ্নি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পরেছে তার কবিতা, গানে। হৃদয়ে অপার প্রেম নিয়ে ভাবতেন সৃষ্টির কথা। মানুষের কথা।

জীবনে বহু কষ্ট করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তার যোগ্য সম্মান দিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ইংরেজদের অত্যাচারে মানুষ যখন দিশেহারা, তখন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে জেলে যেতে হয়েছিল তাকে। শত অত্যাচার সহেও থামাতে পারে নি তাকে। যার অন্তরে আদ্যান্ত বাজে বিষের বাঁশি, তাকে রুখবে কে ?

১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙলাদেশ নিয়ে এসে যোগ্য সম্মান দিলেন নজরুলকে। জাতীয় কবির সম্মানে ভূষিত করলেন। তার পর দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন কবিকে।

মানুষকে তার যোগ্য সম্মান দেখাতেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি গভীর ভাবে ভালবাসতেন কাজী নজরুল ইসলামকে। তাই অনাদরে ভারতের এক ছোট্ট গ্রামে পরে থাকা কবিকে এনে দিয়েছিলেন তার যোগ্য সম্মান।



মহাপ্রয়াণের সেই দিন

সেদিন প্রত্যুষে প্রভাতের সূর্যটাকে ঢেকে দিয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত একটি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। গ্রহণের ক্ষণটি ছিল বিশ্বাসঘাতকদের। মেজর ফারুক, রশিদ, ডালিমদের গভীর ষড়যন্ত্র ছিল দীর্ঘদিনের। পাকিস্তানীদের বহু চক্রান্তের ফাঁদ থেকে বেঁচে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাননি শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসায় নৃশংস-ভাবে স্বপরিবারে হত্যা করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাঙলার ইতিহাসে সে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

সে মানুষটি সারা জীবন ভেবেছেন বাঙলার মানুষদের কথা ভেবে বিসর্জন দিয়েছেন জীবনের সব সুখ। শেষ পর্যন্ত বাঙলার মানুষের হাতেই জীবন দিতে হলো তাকে। বিনা অপরাধে জীবন দিতে হলো সে বাড়ীর সকল সদস্যকে। শুধু বাড়ীর সদস্যই নয় ঘাতকদের নৃসংশতা থেকে বাদ যায়নি সে বাড়ির অতিথিরাও।

বিনা অপরাধে বঙ্গবন্ধু সহ মরতে হলো ২৪ জন মানুষকে। ঘাতকরা কাউকে রেহাই দেয়নি। বাড়ির গার্ড থেকে শুরু করে গৃহপরিচারিকা পর্যন্ত। শিশু রাসেলও রক্ষা পায়নি ঘাতকদের নিষ্ঠুরতা থেকে।

সেদিন বঙ্গবন্ধু বাঙলার মানুষের কর্ণধর হয়ে বিনা অপরাধে, বাক্যহীনভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে ঃ

বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ঃ বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী। একজন আদর্শ বাঙালী নারী। হিসেবে পারিবারিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে ছিলেন আপন হয়ে। অসীম ধৈর্য আর সাহস নিয়ে তিনি পথ চলতেন যেকোন পরিস্থির মধ্যে। বঙ্গবন্ধু যখন

রাজনৈতিক কারণে বন্দি থাকতেন তখন, তাঁর অনুপস্থিতিতে, বেগম ফজিলাতুন্নেসা আগলে রাখতেন গোটা পরিবার। এবং বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বাঙলাদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ছিল তার নিরব কার্যক্রম। নিজেকে প্রকাশ করতে চান নি কখনো।

১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সিঁড়িতে হত্যা করবার পর শোবার-ঘরের দরজায় সামনে শাড়ী পরিহিতা বেগম ফজিলাতুন্নেসাকে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকেরা।

শেখ কামাল ঃ বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। সেতার বাজাতেন ও নাটকে অভিনয় করতেন। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং খেলাধুলার প্রতি ছিল তার খুব ঝোক। তিনি মানুষকে উৎসাহ দিতেন খেলাধুলায়। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। নাট্যচক্রের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। এবং অনেক নাটকে অভিনয়ও করেছেন শেখ কামাল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। লেফটেন্যান্ট হিসেবে কর্নেল ওসমানীর এ ডি সি ছিলেন।

মৃত্যুর ঠিক একমাস পূর্বে তখনকার নামকরা ক্রীড়াবিদ সুলতানা খুকুর সাথে তার বিয়ে হয়। ১৫ই আগস্ট ভোরে গুলিবর্ষণের শব্দ পেয়ে তিনি নীচে নেমে এলে ঘাতকরা সবার আগে তাকে গুলি করে হত্যা করে।

শেখ জামাল ঃ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র। ঢাকা কলেজের ছাত্র শেখ জামাল পরবর্তীতে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে মায়ের সথে গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মৃত্যুর মাত্র একমাস আগে ফুপাতো বোন রোজীর সাঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৫ই আগস্ট সকলের সঙ্গে তাকেও ঘাতকরা হত্যা করে।

শেখ রাসেল ঃ বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ছোট ছেলে এবং সবার অদরের ছোট্ট রাসেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরে ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। ঘাতকরা সকলকে হত্যার পর শিশু রাসেলকে হত্যা করে। হত্যার আগে রাসেল মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল। মাকে দেখাবার কথা বলে উপরে নিয়ে গিয়ে এই বোধ শিশুকে হত্যা করে ঘাতকেরা।

সুলতানা কামাল খুকু ঃ শেখ কামালের স্ত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বে পাকিস্তানের সেরা মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রেকর্ড সৃষ্টি করেন। অসংখ্য স্বর্ণপদক অর্জনকারী সুলতানা কামাল খুকু স্বাধীনতার পরও ক্রীড়াঙ্গনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখেন। মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে শেখ কামালের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ১৫ই আগস্ট পরিবারে অন্যদের সাথে তিনিও নিহত হন।

পারভীন জামাল রোজী ঃ শেখ জামালের স্ত্রী। পারভীন জামাল রোজী বঙ্গবন্ধুর ছোট বোনের মেয়ে। বদরুন্নেছা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী ছিলেন। ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের মাত্র একমাস পূর্বে শেখ জামালের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। অন্যান্যের সঙ্গে বত্রিশ নম্বর বাড়িতেই হত্যা করা হয়েছে তাকে।

শেখ আবু নাসের ঃ বন্ধবন্ধুর ছোট ভাই। একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে থাকা অবস্থায় ১৫ই আগস্ট তিনিও ঘাতকের বুলেটে নিহত হন। আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে বাইরে এনে লাইনে দাঁড় করায় ঘাতকরা। তার পর তাকে চিনতে পেরে বাড়ীর ভিতরে বাথরুমে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

আবদুর রব সেরনিয়াবাত ঃ বঙ্গবন্ধুর সরকারে একজন মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর সহপাঠী আবদুর বর সেরনিয়াবাত বঙ্গবন্ধুর মেজ বোনকে বিয়ে করেন। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি রবিশালে আইনজীবী ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ৭০ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ আগস্ট নিজ বাসভবনে ঘাতকদের আক্রমণে নিহত হন।

শেখ ফজলুল হক মণি ঃ বঙ্গবন্ধুর মেজ বোনের বড় ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বিভাগ থেকে এম এ পাশ করেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও নেতা হিসেবে ১৯৬২, ৬৪, ও ৬৬-র ছাত্র

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে মুজিব-বাহিনীর অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি আওয়ামী যুব লীগের চেয়ারম্যান হন। শেখ ফজলুল হক মণি দৈনিক বাংলার বাণী ও বাংলাদেশ টাইমস এর সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন। ১৫ই আগস্ট হত্যাকান্ডে ঘাতকের গুলিতে তিনি নিহত হন।

বেগম আরজু মণি ঃ শেখ ফজলুর হক মণির স্ত্রী। বেগম আরজু মনি বরিশাল বি এম কলেজ থেকে বি এ পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শেষবর্ষের পরীক্ষার্থী ছিলেন। ফুপাতো ভাই শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দু'সন্তানের জননী। তিনি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঘাতকের গুলিতে নিহত হন।

কর্ণেল জামিলউদ্দিন আহমেদ ঃ বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা। ১৯৫২ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে যোগদান করে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আক্রান্ত হয়েছে শুনে তিনি ১৫ আগস্ট একাই গাড়ি চালিয়ে ছুটে আসেন বঙ্গবন্ধুকে সাহায্য করতে। সোবাহানবাগ মসজিদের সামনে ঘাতকরা হত্যা করে তাকে।

বেবী সেরনিয়াবাত ঃ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছোট মেয়ে। বেবী সেরনিয়াবাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। নিহত হবার সময় বাবার কাছে ছিলেন।

আরিফ সেরনিয়াবাত ঃ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছোট ছেলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। নিহত হবার সময় পিতার কাছে ছিল।

সুকান্ত বাবু ঃ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। এই আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর বড় ছেলে সুকান্ত বাবু। নিহত হবার সময় দাদার বাসায় ছিল। ঘাতকরা এ চার বছরে শিশুকেও গুলি করে হত্যা করে।

শহীদ সেরনিয়াবাত ঃ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের ছেলে। শিক্ষা জীবন শেষ করে বরিশালে আইন ব্যবসা করতেন। দৈনিক বাংলার বরিশালে সংবাদদাতা ছিলেন। ১৫ আগস্ট চাচার বাসায় অবস্থানকালে তিনি নিহত হন।

আব্দুল নইম রিন্টু ঃ আব্দুল নাঈম খান রিন্টু বরিশালের একটি সাংস্কৃতিক দলের সাথে ঢাকায় এসেছিলেন। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় অবস্থানকালে তিনিও নিহত হন।

সিদ্দিকুর রহমান ঃ এসবির সহকারী দারোগা। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কর্তব্যরত ছিলেন। জন্ম কুমিল্লার বুড়িচং থানার জমুর গ্রামে। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে আরো কয়েকজনের সঙ্গে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় ঘাতকের গুলিতে প্রাণ দিতে হয় তাকেও।

কতটা নির্দয় হলে চার বছরের শিশু সহ জাতির জনক শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে মানুষ। তাদের নিষ্ঠুরতায় আরো জীবন দিয়েছে গৃহপরিচালীকা পর্যন্ত। মোট কথা, সেদিন ঘাতকের হৃদয় ঘিরে ছিল কঠিন এক নিষ্ঠুরতায়, বর্বরতায়। যা শুধু অসভ্য দানবেরই থাকে। কোন সভ্য মানুষ এইভাবে নির্বিচারে গণহত্যা ঘটাতে পারে বলে মানুষের বিশ্বাস হবে না।



১৬ জানুয়ারি ১৯৭২ জাতীয় শোকদিবসে শহীদ মিনার চত্বরে শোকাহত মানুষের মাঝে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল ওসমানী, মোহাম্মদ হানিফ, মিসেস বদরুন্নেছা প্রমুখ।



শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী

আমি বাঙ্গালী। বাঙলা আমার মায়ের ভাষা। এবং আমি শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ। যদি আমি হই নোবেল বিজয়ী। যদি আমার প্রতিভা হয় আকাশ ছোয়া। আর আমি হই পরাধীন। তাহলে তার মূল্য কোথায় ?

যদি আমার কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ডই না থাকে, তবে শুধু যে আমি বাঙ্গালী সেই পরিচয় কতটুকু পরিচিত হবো আমি। জাতী হিসেবে আমরা যত উন্নত হইনা কেন। যদি আমাদের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রই না থাকে তবে সবই যে বৃথা মনে হয়।

ঠিক কোন মালি বা দাসের মতো। জীবনের সবটুকু দিয়ে অন্যের বাগানে ফুল ফোটান বা জীবন দিয়ে দায়িত্ব পালন করা। আমার কষ্টে ফোটানো শুভ্র ফুলগুলোর উপর কোন মালিকানা নেই আমার। শুধুই চেয়ে দেখা ছাড়া আর কোন অধিকার নেই আমার। কারণ আমি দাস, আমি পরাধীন। আমার কাঁধে জোয়াল তুলে দিলে হালচাষে আমি বাধ্য, বা ঘানি বেঁধে দিলে তা চক্রকারে তৈল তৈরী করতে বাধ্য হই আমি। অথচ, কোনটিতেই আমার অধিকার নেই। অধিকারের কথা বলা যেন পাপ। কারণ আমি পরাধীন। অধিকারের কথা বললেই যত্রতত্র কেটে যাবে মাথা।

আমি বাঙালী। বাঙলাদেশ আমার জন্মভূমি। আমি বাঙলাদেশী। এই পরিচয় জাতিকে নিয়ে যাবে বহুদূর। আমাদের একটি রাষ্ট্র আছে। আমরা পরাধীন নয়। বাঙলাদেশ আমাদের দেশ। পৃথিবীতে বহু জাতি আছে তাদের কোন নির্দিষ্ট ভূখন্ড নেই। তাই তাদের পরিচয়ও নেই। অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হতে হয় তাদের।

স্বাধীন বাঙলাদেশের রূপকার শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানীদের সকল শোষণ, নির্যাতন থেকে যে মানুষটি পুরো জাতিকে মুক্তি দিয়ে ছিলেন, সেই হলো বঙ্গবন্ধু। বাঙলার মানুষকে তিনি ভালবাসতেন নিজের চেয়েও বেশি।

বিশাল জনসংখ্যার একটি জাতিকে যেদিন পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করেছিলেন তিনি। সেদিন থেকেই তিনি বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সন্তান। তার জন্য মানুষের ভোটের প্রয়োজন হয় না। কারণ তার দেয়া স্বাধীনতার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বাঙলার ৯৮ ভাগ মানুষ। বাঙলার মানুষের হৃদয়ে আছে শেখ মুজিবুর রহমান।

পথ চলে অনেকেই। কিন্তু পথ দেখায় একজনই। যেমন, এই পৃথিবী যখন অন্ধকার, কুসংস্কার, গোড়ামী আর বৈষম্যের চরম স্বীকার হচ্ছিল মানুষ। ধর্মহীন মানুষগুলো এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছল, যেখানে মানুষ ছিল মানুষের কাছেই কেনাবেচার পণ্য, জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুতে রাখে হত্যা করা হতো। কারণ কন্যা সন্তান প্রসব ছিল বড় অপমানকর, অভিশাপ।

ঠিক তেমনি সাম্য আর শান্তি বাণী নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স) এর। সেই তমশাঘোর আঁধারের বুকে দাঁড়িয়ে তিনিই প্রথম বললেন, বিধাতার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ মানুষের দাস হয় না। সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি এবং বান্দা। তিনি একমাত্র উপাসক। সেটাই আলোর পথ।

যদিও তখন অট্টহাসিতে ফেটে পরেছিল আরবের পৌত্তলিকরা। তারা ভাবতেই পারেনি দাস কি করে হয় মুনিবের সমতুল্য। তারা ছিল অন্ধ। তাই একটি সহজ সত্য তাদের মাথায় আসেনি। তা হলো, দাস মানুষের তৈরী, মানুষকে নীচু করে রাখার একটি পদ্ধতি। আর বিধাতার সৃষ্টি সকল মানুষ। তিনিই সকল মানুষের প্রভু। মানুষ কখনো মানুষের প্রভু হতে পারে না।

অসম্যতার বিরুদ্ধে কথা বলে দেশত্যাগ করতে হয়েছে কার্লমার্কস। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্রাটের দুঃশাসন থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিল লেনিন।

ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব করে নিজের জীবন দিয়ে প্রথম বিপ্লবের পথ সুগম করে গেছেন ক্ষুদিরাম বসু। তার পর বহু বিপ্লবী এসেছেন এই পথ ধরে। জীবনও দিয়েছেন অনেকেই। তাই দেশও আজ স্বাধীন।

বহু রক্ত আর মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ঝান্ডা হাতে চীনের মানুষকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, মাও সে তুং। বৈষম্য, বর্বরতা আর শোষণ থেকে চির দিনের মতো মুক্তি পেয়েছে চীনের মানুষ।

আর আমাদের হৃদয়ের মাঝে অনিরুদ্ধ উৎগত স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দেখানো পথেই হেঁটেছে

পুরো জাতি। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে মুঠো-মুঠো স্বপ্ন এঁকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার।

তাঁর সেই দেখানো পথ আর স্বপ্ন লয়ে পথ চলে স্বাধীন হয়েছে বাঙলাদেশ। তার কণ্ঠেই প্রথম বেজেছিল স্বাধীনতার সুর। সেই সুর অসীম শক্তিতেই জেগে উঠেছিল বাঙলার মানুষ।

তার মৃত্যুর বহু বছর পরে বিবিসি আয়োজন করে শ্রেষ্ঠ বাঙালী তালাশের অনুষ্ঠান। বাঙলাদেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বি বি সি বাঙলা শোনে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ। এই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে ১২ মিলিয়ন বাঙালী ভোটে অংশ নেয়।

বি বি সি কতৃপক্ষ বাঙালীদের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ ২০ জনের উপর ভোট করতে বলে শ্রোতাদের। নির্বাচনে তাদের মধ্যে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর সাথে সেরা ২০ মধ্যে আরো ছিলেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যজিৎ রায়, অমরত্ত সেন, বেগম রোকেয়া সাখায়ত হোসেন, সুবাস চন্দ্র বোস, জগদীশচন্দ্র বসু আরো কয়েকজন।

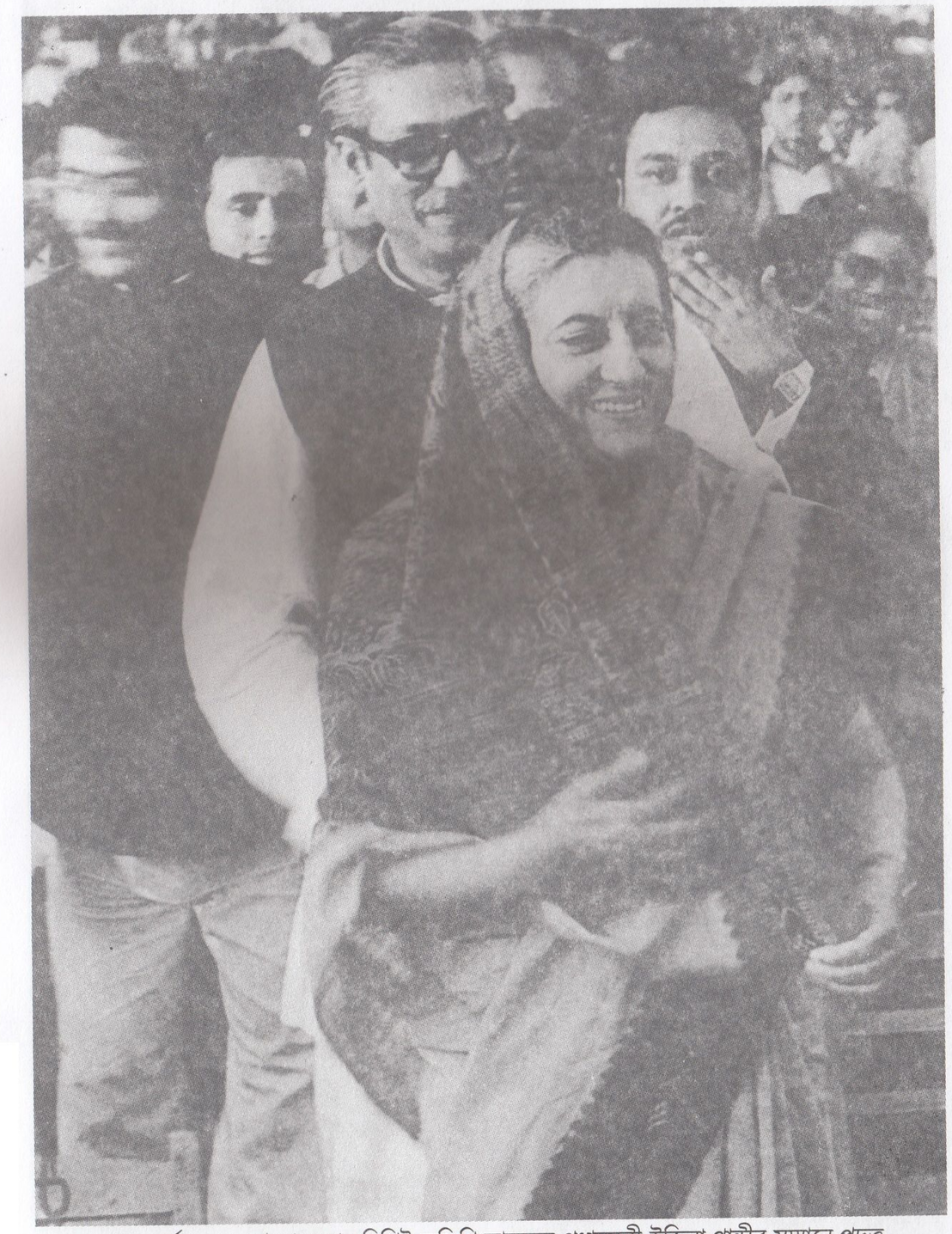
বাঙলার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে গভীর শ্রদ্ধা ভরে আজীবন স্মরণ করবে বাঙালী। যতদিন পৃথিবী আছে, যতদিন বাঙলা থাকবে, যতদিন মানুষ কথা বলবে বাঙলায়, যতদিন বাঙলা থাকবে অন্তরে। তাকে ভুলে যাওয়া যেন নিজেকেই ভুলে যাওয়া। তার দান অস্বীকার যেন নিজের সাথেই প্রবঞ্চনা, প্রতারণা।

তুমি এলে তাই, পথিক পেল পথ।
তুমি এলে তাই, মুক্ত কণ্ঠে পাখিরা গায় গান।
তুমি এলে তাই, বাঙলা পেল বাঙালী।

তুমি এলে তাই, ভাষা পেল মুক্তি।
তুমি এলে তাই, হে বঙ্গবন্ধু, চঞ্চলমতি
হাওয়ারা হলো অবমুক্ত।
তুমি এলে তাই, বাঙলা পেল মুক্তির স্বাদ।

তুমি এলে তাই, নজরুলের কবিতা পেল অপার স্বাধীনতা,
রবি ঠাকুরের গান ফেল সুর,
জীবনান্দ দাস হারালো বাঙলার পথে।
তুমি এলে তাই, মায়ের বুক হলো পূর্ণ,
কম্পিত ভয়ে, যে শিশু নিশ্চুপ ঘুমিয়েছিল
অন্ধকার ঘরে; সে তার কাঁচা গ্রন্থীলে ভর করে
প্রভাতি বেলায় এলো সূর্য দেখতে।
নবজাতকের চিৎকার হলো বড় মধুর।
হে বঙ্গবন্ধু, তুমি এলে তাই,
স্বাধীনতা পেল আমার লেখার ভাষা।
আমি লিখি কবিতা, গান, গল্প
লিখি মনের ভাষায় ইচ্ছেমতো।
তৃপ্ত হই, আবার গভীর তৃপ্ততায় ভরিয়ে দেই,
বাঙলার বুক।
হে বঙ্গবন্ধু তুমি এলে তাই,
বাঙলা হলো স্বাধীন, শত্রু মুক্ত হলো,
জীবন পেল চলার পথ,
ফাগুন এলো বাঙলায়,
ভূবন হলো মধুর।
হে বঙ্গবন্ধু।

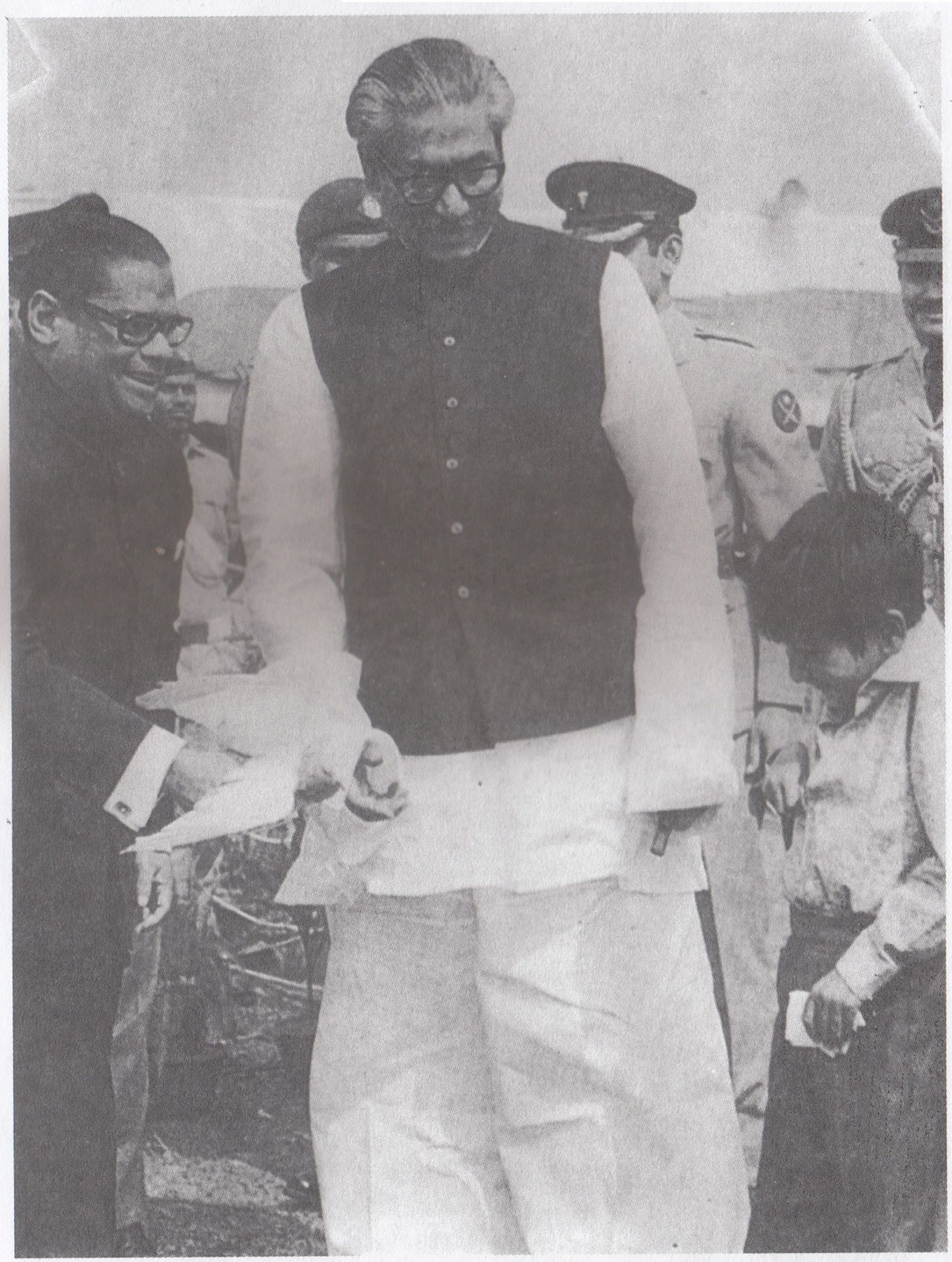
সমাপ্ত



১৮ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের বিশিষ্ট অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মানে প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও ইন্দিরা গান্ধী।



২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ গ্রেনেড ছুঁড়ে হানাদার বাহিনীর বাংকার বিধ্বস্তকারী শিশু মুক্তিযোদ্ধা শহীদুর রহমান লালুকে বঙ্গবন্ধু তার সাহসের জন্য কোলে তুলে নেন। পাশে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।



২৬ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রেসিডেন্ট আবু সাঈদ চৌধুরী শান্তির কপোত উড়ানোর এক পর্যায়ে কৌতুক করে শেখ রাসেলকে বলছেন, 'তুমি উড়াবে, নাও।' পাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।



বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলার মাটিতে পদার্পণ; জনতার উল্লাস

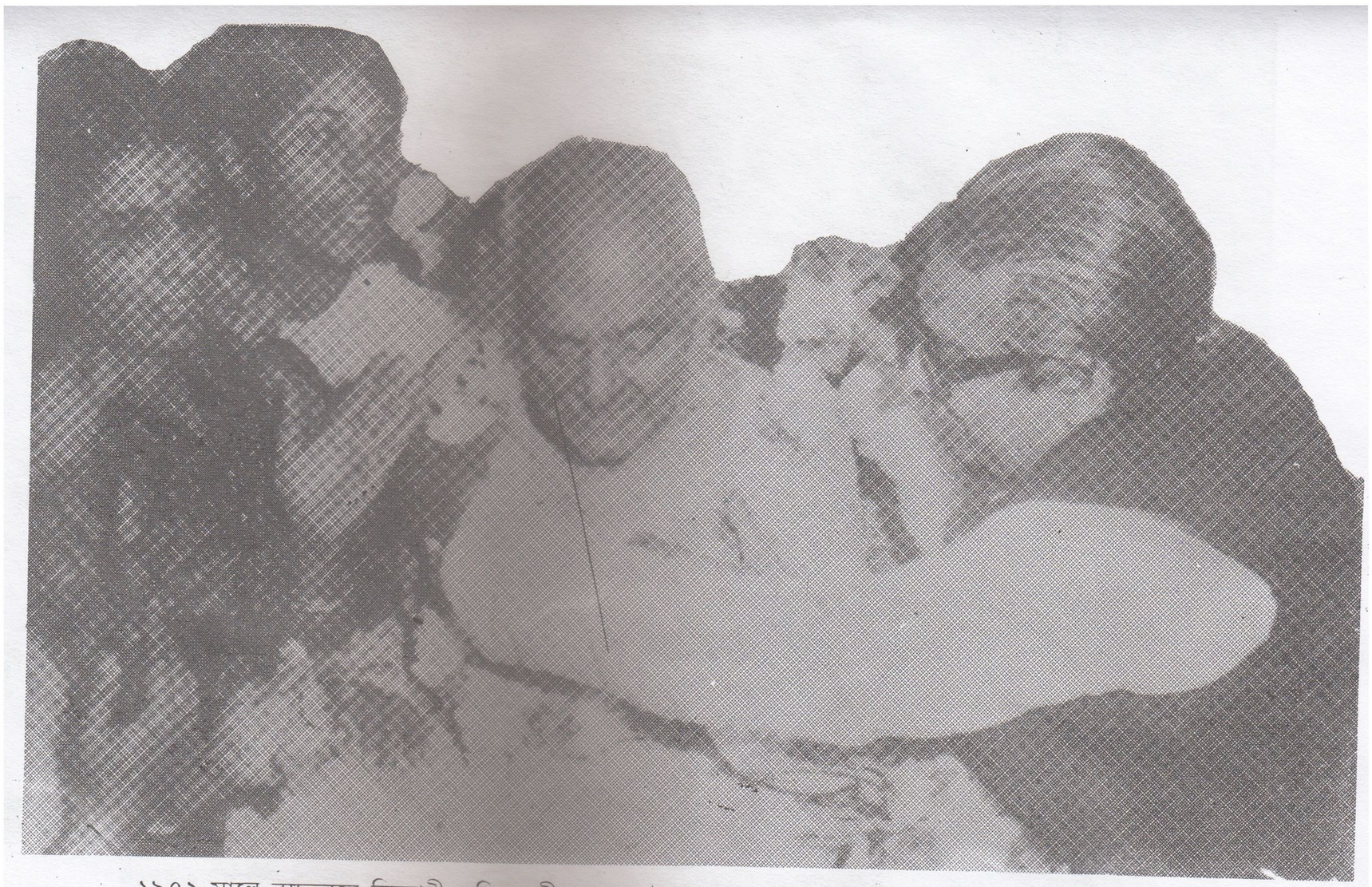
ছবি : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী, আফতাব আহমদ-এর অ্যালবাম থেকে



পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে এসে প্রথম জনসভায় বঙ্গবন্ধু



আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



১৯৭২ সালে বঙ্গভবনে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে মাল্য ভূষিত করছেন বঙ্গবন্ধু

Bangladesh * Northern University Library *



২৬শে মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



২৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ৩২নং ধানমন্ডির বাড়িতে উৎফুল্ল জনতার মাঝে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান